জীবনের পথে

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল,
প্রণীত ।

৭৮।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য।
অন্নদা বুক-ষ্টল,
৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

গ্রন্থকার প্রণীত

পৈতৃকসম্পত্তি
(গার্হস্থ্য উপন্যাস) ১॥০

শুক[illegible]ছেলের বই) ॥০

প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্নদা বুকষ্টলে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নিউ সরস্বতী প্রেস,
২৫।এ-মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শিশির বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দিনকতক একটু ভাল হইয়াছিল। বড় বেশী কাহারও সহিত মিশিত না, নিয়মিত ভাবে কারবারে বাহির হইত। কিন্তু দু'দিন না যাইতে যাইতেই সে একটু একটু করিয়া পুনর্ব্বার নিজ মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল। পূর্ব্বের বন্ধু-বান্ধব সব ক্রমেই তাহার সঙ্গীরূপে আবার জুটিতে লাগিল। পুত্রের ব্যবহারে চপলা মুখে কিছু না বলিলেও ভিতর ভিতর বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল। শিবশঙ্কর বাবু ত একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেশে আনিতে পারিলে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে পুত্রের স্বভাব-চরিত্র ক্রমেই সংশোধিত হইয়া যাইবে, দু'চার দিন তাহাকে শান্ত-শিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এ বিষয়ে অনেকটা আশারও সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু শিশির যেন "পুনর্মূষিকের" অবস্থায় পরিণত হইল। প্রথম প্রথম শিশির কদাচ কোন দিন রাত্রে বাহির হইয়া মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিত, কিন্তু পরে তাহা তাহার দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত হইল। মধ্যে মধ্যে অন্য লোকে অচৈতন্য অবস্থায় তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ী দিয়া যাইতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা দেখিল, সে একজন পাকা মাতাল হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্ব্বদাই তাহার ভয়ে শঙ্কিত থাকিত।

একদিন শিবশঙ্কর বাবুর একজন প্রজা ভৃত্য হরিকে ডাকিয়া বলিল,—"তোমাদের বাবুর ছোট ছেলের হলো কি? একেবারে উচ্ছন্ন গেল যে!"

বৃদ্ধ হরি মনের দুঃখে ঘাড় নাড়িল। বলিল,—"আর কি হবে? বাবু অনেক চেষ্টা করলেন, কোনও ফল হলো না। ছোট দাদাবাবু আর কাজেও বেরোয় না, দিনরাত আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"আমি হলে অমন বুড়ো ছেলেকে বাড়ীতে বসে খাওয়াতাম না, দূর করে দিতাম।"

"বাবু আর কি করবেন? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে পথে ঘাটে ভিক্ষে করে তাকে দিন কাটাতে হবে। বাপ হয়ে আর সেটা কেমন করে চোখে দেখে বল!"

"সেইটেই তোমাদের ভুল ধারণা! বাড়ী থেকে তাড়ালেই ওর চৈতন্য হবে। তখন পেটের জ্বালায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা উপার্জ্জন করতে হবে।"

হরি চুপ করিয়া রহিল। ভাবিল, পরের বেলায় উপদেশ দেওয়া বড় সহজ, নিজেরা সমান অবস্থায় পড়িলে কতটা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, সে বিষয়েই ঘোর সন্দেহ। পুত্র-

স্নেহ বিসর্জ্জন দেওয়া স্নেহশীল জনকের পক্ষে কত শক্ত, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের অনুভব করা অসম্ভব!

"সেদিন দেখলাম মদ খেয়ে রাস্তায় এক মেয়েমানুষ নিয়ে কেলেঙ্কারি করছে। যাহোক, তাতে আমাদের কিছু ক্ষেতি নেই, কিন্তু কাল শুনলাম মদ খেয়ে আমাদের পাড়ায় এসে মণ্ডলদের যুবতী মেয়ে ঘাটে বসে বাসন মাজছিল, তাকে তাড়া করেছিল, পরে সে পুকুরে ঝাঁপ খেয়ে তবে নিজের মান বাঁচায়। কর্ত্তাকে আমরা দেবতা বলে ভক্তি করি, তাঁর ছেলে বলেই আমরা কিছু বল্লাম না; কিন্তু ভবিষ্যতে এমন অন্যায় আবার করলে আমরা কিন্তু আর সহ্য করবো না, তা বলে রাখছি। তখন আর কর্ত্তাবাবু আমাদের দোষ দিতে পারবেন না!"

শিশিরের দিনগুলা এই ভাবেই কাটিতে লাগিল। রাত্রে মদ খাইয়া সে মাতলামি করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর দেহ সুস্থ করিতে দিনের বেলাটা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিত। চপলা পুত্রকে কত অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হইলে পুত্রের সম্মুখেই বসিয়া সে কাঁদিত, যখন বড়ই অসহ্য হইত, তখন রাগে তাহাকে ভৎর্সনাও করিত। শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে কত মিষ্ট কথায় বুঝাইতে লাগিলেন, বাড়ী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দিনের বেলা যখন মদ্যপানের ফলে মস্তকের ব্যথায় অস্থির হইত, অন্তঃকরণটা অনুতাপে একটু দ্রবীভূত হইত, সে প্রতিজ্ঞা করিত মদ আর স্পর্শ করিবে না।

ললিত অবসর পাইলেই তাহাকে বুঝাইত, "এ ভাবে দিন কাটালেও ভবিষ্যতে তার কি দুর্দ্দশা হবে? সে যে একেবারে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হয়ে যাবে!" সে মধ্যে মধ্যে শিশিরকে প্রশ্ন করিত, "এ বদ্ অভ্যাস তোর কেন জন্মাল? এত বাড়াবাড়িই বা কেন করিস্?" শিশির উত্তরে সত্যই বলিত, সেও ইহার কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। সে যে কি প্রকারে এত দ্রুত অধঃ-পতনের নিম্নতম স্তরে নামিয়া গিয়াছে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না, অপরকে আবার কি বুঝাইবে?

অল্প মদ্যপায়ীই ইহা বুঝিতে পারে। পৃথিবীতে যত রকম নেশা আছে তাহাদের মধ্যে মদ্যপানই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক নেশা। মানুষকে পাপ পথে প্রলুব্ধ করিতে ইহার ক্ষমতা অসীম। অপর কোনও নেশা বা পাপ প্রবৃত্তি এরূপ অলক্ষিতে, চুপি চুপি মানুষের মন হরণ করিতে পারে না। দিবা অবসানে অন্ধকার যেমন তাহার পক্ষপুট বিস্তার করিয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি বিদায়প্রার্থী ম্লান আলোক-রশ্মিকে আচ্ছাদন করে, প্রভাতের প্রথম অস্ফুট আলোর ন্যায় অজ্ঞাতভাবে, শীতের পর গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্মের পর শীতঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায় দ্রুত ও নিশ্চিত ভাবে, কিংবা মহাকালের গতির ন্যায় অতর্কিতে ও অপ্রত্যাশিত ভাবে, সেও একটু একটু করিয়া পদবিক্ষেপ করে; কিন্তু এক বিষয়ে এই সব হইতে ইহার গতি সম্পূর্ণ পৃথক। আসন্ন রজনীর কোমল অন্ধকাররাশি, প্রভাতের ক্ষীণ আলোকপুঞ্জ, ষড়্ঋতুর

নিঃশব্দ প্রবাহ, মৃত্যুর তুষার-শীতল আলিঙ্গন, এ সবের কার্য্যে বাধা দেওয়া মানুষের ক্ষমতার বাহিরে, বেদোল্লিখিত সত্যের ন্যায় ইহাদের কার্য্যবিধির পরিবর্ত্তন করা আমাদের সাধ্যাতীত, কিন্তু মদ্যপানের নেশা ইহাদেরই মত গুপ্তভাবে আমাদের দেহ ও মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেও, প্রথম আক্রমণেই চেষ্টা করিলে আমারা ইহার গতিরোধ করিয়া দূরে সরাইয়া দিতে পারি।

শিশিরও প্রথম চেষ্টা করিলে এ নেশার বশীভূত হইত না, কিন্তু এখন সহজে বহুদিনের এ বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করা তাহার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মদ্যপূর্ণ পাত্র সম্মুখে দেখিলে সে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। জলাভূমিতে আলেয়ার আলো যেরূপে পথভ্রান্ত পথিককে মৃত্যুর মুখে চালিত করে, সুরাপানও সেরূপ নেশান্ধ জীবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। সময় সময় সংশোধনের বলবতী ইচ্ছা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইত। শিশির দেখিত তাহার বাল্যের সঙ্গী ও যৌবনের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বড় হইয়া সংসারে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। সকলে তাহাদের ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে; কিন্তু সে বুঝিত যে ধ্বংসের পথে সে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করা আর সূর্য্যকে তাহার নির্দ্দিষ্ট গতি হইতে স্থানান্তরিত করা, একই কথা।

শীঘ্রই এই বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বল চিত্তকে সংযত ও

দৃঢ় করিবে, বাপ মার নিকট এ প্রতিজ্ঞা করিতে সে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইত না। চপলা বারংবার প্রতারিত হইয়াও তাহার কথায় বিশ্বাস করিত, তাহার অবস্থা দেখিয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করিত, দেহের ব্যথা মরিয়া যাইবে বলিয়া প্রাতঃকালে চায়ের বাটী হাতে লইয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে চা খাইতে দিত। মাতার উপর সে তখন কোনও বিরক্তি প্রকাশ করিত না বটে, কিন্তু সে এরূপ ভাব দেখাইত যেন চায়ের পাত্র না হইয়া মদের পাত্র হইলেই সে উহা সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারিত। চা তাহার প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সমর্থ হইত না। মা ঘর হইতে চলিয়া গেলেই সে ঘরের নিভৃত স্থান হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া লুকাইয়া বসিয়া খাইত, মা পাছে দেখিতে পায়; কারণ এই কিছুপূর্ব্বে সে তাহার নিকট মদ্যপান ছাড়িতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিতে না করিতেই তাহার প্রাতঃকালের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছায়া-বাজির ছবির ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে আবার সঙ্গীদের সহিত স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে মদের দোকানের দিকে অগ্রসর হইত।

শিবশঙ্কর বাবুর ও চপলার অন্তঃকরণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চপলার স্বভাবেরও আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সে আর চাকর-বাকরকে তিরস্কার করে না, ললিতের উপর বিনা কারণে বিরক্ত হয় না; দিনরাতই নিজের ঘরে বসিয়া

অশ্রুজল মোচন করিত এবং মধ্যরাত্রেও নিদ্রিতাবস্থায় গভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্তঃকরণের গভীরতম স্থল হইতে উত্থিত হইয়া নৈশ সমীরণে কম্পিত হইয়া উঠিত। শিশিরের দুর্নীত ব্যবহারে প্রতিবেশীরা সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। কাহাকেও বাড়ী আসিতে দেখিলেই চপলার ভয় হইত বুঝি বা পুত্রের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করিতে আসিতেছে। অথচ মনের দুঃখ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে না পারিয়া সে ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া মরিতে লাগিল।

চপলার অন্তঃকরণ অহর্নিশ গভীর অনুতাপানলে দগ্ধ হইত। সে অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাহারই দোষে পুত্রের আজ এই হীন অবস্থা ঘটিয়াছে। সে শিশিরকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া, অযথা স্নেহ করিয়া তাহার মাথা একেবারে খাইয়া দিয়াছে। সে কখনও পুত্রের দোষ দেখিত না, দোষ লক্ষ্য করিলেও তাহা সংশোধনের নিমিত্ত তাহাকে কখনও উপদেশ দেয় নাই, বরং শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে শাসন করিতে গেলে সে শিশিরের পক্ষ সমর্থন করিয়া স্বামীকেও প্রতারিত করিয়াছে। পুত্রের পার্থিব সুখ-সম্পদ বিধানেই সে সর্ব্বদা তৎপর ছিল, তাহাকে সংযম বা নীতি-শিক্ষা জীবনে কখনও দেয় নাই। করুণানির্ঝর সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলময় বিধানের উপর বিশ্বাস করিতে, পিতামাতার বাধ্য হইতে, তাঁহাদের ভক্তি করিতে, নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন করিতে, আহারে ও বিহারে সংযম শিক্ষা করিতে সে তাহাকে কখনও উপদেশ দেয় নাই। তাহার বর্ত্তমান ফল অতীব

ভয়ঙ্কর হইলেও সে বুঝিত যেমন বীজ বপন করিয়াছে, তাহার ভাগ্যে তেমনই ফসল জুটিয়াছে। আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিত ; সে ভাবিত তাহার এ পাপের কিছুতেই ক্ষমা নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই একটা ব্যর্থ আকাঙ্খা তাহার অন্তঃকরণ হইতে উঠিয়া ওষ্ঠাধরে কম্পিত হইয়া যাইত, হায় কেন সে বন্ধ্যা হইল না!

শিশির ক্রমেই বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল। একদিন মদ খাইয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত সে এক বারনারীর বাড়ী গিয়া হাজির হইল। পরে আমোদ-প্রমোদের পর স্ত্রীলোকটাকে মদ খাওয়াইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ফেলিয়া শিশিরের সঙ্গীগণ তাহার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিয়া চম্পট দিল। অবশ্য শিশির তাহার একখানি অলঙ্কারেও হাত দেয় নাই বা এ হীন কার্য্যে তাহাদের কোনও রূপ সাহায্য করে নাই বটে, কিন্তু সঙ্গদোষে পড়িয়া তাহারও নাম হইল। পুলিশে তদন্ত করিয়া শিশিরকে শুদ্ধ চৌর্য্যাপরাধে ধৃত করিল। এ সংবাদ শুনিয়া শিবশঙ্কর বাবু একেবারে জীবন্মৃত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল পিতা ললিতের পরামর্শে বিস্তর টাকা খরচ করিয়া আদালত হইতে পুত্রকে খালাস করিয়া আনিলেন। পাড়ার স্ত্রীপুরুষে সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল,—"হায় মিত্তিরবংশে কি কুলাঙ্গারই জন্মেছিল! এমন ছেলেকে আঁতুড়ে কেন গলা টিপে মেরে ফেলে নে!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনা অপরের জীবনে ঘটিলে বোধ হয় তাহার জীবনের গতিকে ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করাইয়া দিত কিন্তু ইহার পরও শিশিরের স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। এই সব বদ্ অভ্যাস তাহার জীবন-যাত্রার সহিত এত ঘনিষ্টভাবেই সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল! শিশির তাহা ভাবিয়াই বোধ হয় স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করিতে আদৌ চেষ্টা করে নাই, কিংবা চেষ্টা করিলেও সফল হইতে পারে নাই। স্বভাব-চরিত্রের সংশোধন হওয়া পরের কথা, সে দিন দিন আরও অবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকালে দুপুরে ও রাত্রে কোন সময়েই তাহাকে আর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইত না।

শিশির তাহার পিতার নিকট প্রায়ই টাকার তাগাদা করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। শিবশঙ্কর বাবু টাকা দিতে অস্বীকার করিলে সে তাহাকে নানা কর্কশ কথা শুনাইয়া দিয়া উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। আজ তিন দিন ধরিয়া সে দিনরাত মদ খাইতেছে, তাহার কার্য্যাবলি লক্ষ্য করিলে তাহাকে পূর্ণ উন্মাদ বলিয়াই সকলের ধারণা হইবে। চপলা স্বামীর নিকট বসিয়া কাতর-ভাবে কাঁদিতেছিল। শিবশঙ্কর বাবু গভীর শোকের বেগে

একেবারে গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু পোকা যেমন একটু একটু করিয়া মাটি খুঁড়িয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ অসহ্য যন্ত্রণার বেগ তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিকে কাটিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। পূর্ব্বে তাঁহার উন্নত মূর্ত্তি, সবল সুশ্রী আকৃতি দর্শকের মন মুগ্ধ করিত, কিন্তু এই শেষ দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার দেহযষ্টি শীর্ণ ও অবনত, তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায়, তাঁহার গণ্ডস্থল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যষ্টিতে ভর না দিয়া তিনি পথ চলিতে পারেন না। বয়োবৃদ্ধির জন্য যে তাঁহার দেহের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নহে; মানসিক যন্ত্রণায় হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত এক একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁহার শরীরের রক্ত জল করিয়া দিয়াছে। যে পুত্রকে তিনি কত স্নেহ করিতেন, কত যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন, যাহার সুশিক্ষার জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই, যে তাঁহার বার্দ্ধক্যে সুখ ও সান্ত্বনার স্থল হইবে বলিয়া তিনি এতদিন মনে মনে কত না আশাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই পুত্রই এখন তাঁহার বিষম লজ্জা ও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার জীবনকে অশেষ দুঃখ ও সংগ্রামের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার দ্রুত অবসানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে!

চপলা রাত্রে বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল,

ঘুমাইতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার চোখের পাতায় ঘুম আদৌ দেখা দিল না। শিশির পাগলের ন্যায় বাড়ীর উপর নীচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। শেষ রাত্রে তাহার চীৎকার থামিয়া গেল। সে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তখন চপলার মন একটু শান্ত হইল, সে কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু বুঝিল। কিন্তু ভোরের আলো উন্মুক্ত জানালা দিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই সে ধড়ফড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর চিন্তা ও উদ্বেগ আসিয়া পুনর্ব্বার ভূতের ন্যায় তাহার অন্তঃকরণের উপর চাপিয়া বসিল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিল। উঠিয়াই সে ঈশ্বরের নিকট শিশিরের মঙ্গল-কামনায় প্রার্থনা করিল; মানুষের দ্বারা এ বিপদে সাহায্যলাভের আশা এখন একেবারে দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। পুত্রের মতি-গতি খারাপ হইবার পর প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যা চপলা এরূপ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, যেন ভগবান শিশিরকে সৎপথে আসিবার প্রবৃত্তি ও যথাযোগ্য শক্তি দান করেন, কিন্তু তাহার স্বভাব-চরিত্রের কোন সংশোধনই হয় নাই। তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইলেও সে ভগবৎচরণে নিয়মিত প্রার্থনা জানাইতে ছাড়ে নাই।

সকালে উঠিয়া শিবশঙ্কর বাবু নিজের কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। আহারের সময় অসুস্থ অবস্থায় তিনি বাড়ী ফিরিয়া

আসিলেন, আর বাহির হইলেন না। সন্ধ্যার সময় কম্প দিয়া তাঁহার জ্বর আসিল। এমন সময় শিশির শিথিল বসনে মন্থর গতিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সকালে উঠিয়া সে কোথায় বাহির হইয়াছিল, এই প্রথম বাড়ী ঢুকিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, আকৃতিতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের চিহ্নসমূহ যেন স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পায়ে জুতা নাই, কাপড়ের একটা অঞ্চল ও জামার হাতাটা ছিন্ন। শিবশঙ্কর বাবু একবার তাহার দিকে তাকাইয়াই চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। শিশির স্খলিত পদে পিতার নিকট অগ্রসর হইতে গিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। চপলা কম্পিত হস্তে তাহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইল।

শিবশঙ্কর বাবুর নিকট আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার জন্য সে মনের মধ্যে সাহস সংগ্রহ করিতেছিল। সে কথা আজ বলিতেই হইবে। গতরাত্রে উন্মত্ত অবস্থায় সে পিতার নিকট টাকা চাহিয়াছিল, এখন ধীরভাবে কিসের জন্য টাকার দরকার তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সে আবার মহাজনের নিকট দেনা করিয়াছে। বাড়ী আসিবার পর তিনচারি বার সে এরূপ বিস্তর টাকা ধার করিয়াছিল, শিবশঙ্কর বাবু প্রতিবারই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন। এবারও এ সঙ্কট হইতে তাহাকে উদ্ধার না করিলে তাহাকে জেলে পচিয়া মরিতে হইবে। শিশির কোনও রকমে চোক্-কাণ বুজিয়া পিতার নিকট প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিল।

শিবশঙ্কর বাবু তাহা শুনিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন,—"তোমার জন্যে আমি প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। যেটুকু এখনও বাকি আছে, তাও শেষ করতে চাও? এই কিছুদিন আগে আমি তোমার সব দেনা শুধে দিলাম, টাকা না দিলে তোমাকে জেল খাটতে হতো, আবার আজ টাকা চাইতে লজ্জা করে না?"

শিশির চুপ করিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে একটু জ্ঞান হইলে কৃত কার্য্যের জন্য যথার্থই সে অনুতপ্ত হইত, কিন্তু সে ভাব ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এ ক্ষেত্রে তাহার উত্তর দিবারও কিছু ছিল না।

শিবশঙ্কর বাবু বলিতে লাগিলেন,—"দেশে ফিরে আসবার পর কতবার তোমার দেনা শুধলাম? তোমার কিছুরই অভাব নেই। খাওয়া দাওয়ায় কাপড় চোপড়ে তোমার আধ পয়সাও খরচ হয় না। যখন যা চাচ্ছ, তাই পাচ্ছ; তবু এত দেনা কেন? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এতদিন যা কিছু জমিয়েছিলুম, সব উড়িয়েছ। তাতেও তোমার চৈতন্য হলো না? আমি অবর্ত্তমানে তোমার চলবে কি করে?"

শিশিরের টাকা চাই-ই। সে কোনও প্রকারে নানা কারণ দেখাইয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করিতে চেষ্টা করিল। শিবশঙ্কর বাবু পুনর্ব্বার তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমাকে টাকা দিয়ে দিয়ে কারবারটাও নষ্ট হতে বসেছে। ললিতের প্রতি

আমার ভয়ানক অবিচার হচ্ছে। একদিনের জন্যেও সে আমার মনে একটু কষ্ট দেয় নি। তুমি যদি এমন করে টাকা খরচ কর, তাহলে ভবিষ্যতে তাকে আর এ ব্যবসা চালিয়ে খেতে হবে না। নিজের হলেও অমন ভাই হাজারে একটা মেলে না। সে একটিও কথা বলে না; কিন্তু আর আমি তাকে পথে বসাতে পারি নি। এবার কত টাকা দেনা করেছ?"

শিশির অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"প্রায় হাজার টাকা। এ টাকা—"

শিবশঙ্কর বাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া বিস্ময়সহকারে বলিলেন,—"হাজার টাকা! এত টাকা কিসে খরচ করলে? এত টাকা আমি আর দিতে পারি না। তুমি আমাকে যতদূর কষ্টে ফেলতে হয় ফেলেছ, আবার তোমার মাকেও দেখছি অবশিষ্ট জীবন দাসীবৃত্তি করে জীবিকা উপার্জ্জন করাতে চাও? আমার কথা ছেড়ে দাও"—বলিতে বলিতে আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল,—"আমি আর বেশী দিন তোমাদের জ্বালাতন করবো না। আমার গণা দিন ফুরিয়ে এসেছে। এ শোকতাপপূর্ণ সংসার থেকে যেতে পারলেই আমি বাঁচি।"

চপলা মুখে কাপড় ঢাকিয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শিবশঙ্কর বাবুর গলার স্বর ক্রমেই নরম হইয়া আসিতে লাগিল। মানসিক যন্ত্রণার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তিনি এ ক্রোধান্বিত ভাব আর

বেশীক্ষণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি শিশিরকে বুঝাইলেন এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করিলে খরচ জোগান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। নিজের প্রতি, পিতামাতার প্রতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঈশ্বরের প্রতি সে যে কতদূর অন্যায় ব্যবহার করিতেছে, এ পাপের যে কিছুতেই ক্ষমা নাই, তাহাও তিনি উল্লেখ করিলেন। শিশির নীরবে অনুতপ্ত হৃদয়ে সব কথা শুনিল, পরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রকাশ্যভাবে নিজের অন্যায়ের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তাহা সংশোধন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিবার দিন রাত্রে ললিতের সম্মুখে সে যেমন কাতরভাবে কাঁদিয়াছিল, আজও সেই ভাবেই কাঁদিতে লাগিল। শিবশঙ্কর বাবু ও চপলা ইহা যোগ্য অবসর ভাবিয়া তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য কত অনুনয়-বিনয় করিলেন। শিশিরও গম্ভীর ভাবে তাঁহাদের কথামত চলিতে প্রতিজ্ঞা করিল। হতভাগ্য যুবক যথার্থই অন্তরেব সহিত পিতামাতার নিকট সৎপথে আসিতে শপথ করিল। পাপের বোঝা দিন দিন বেশী ভার হইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। দেহ জীর্ণ, চিত্ত অবসন্ন, মধ্যে মধ্যে সে আপনাকে জীবিত অপেক্ষা মৃত বলিয়াই জ্ঞান করিত। শিবশঙ্কর বাবু শিশিরের হাতে টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন, তবে তাহার পাওনাদারদের নাম ও প্রত্যেকের দেনার হিসাব

তাঁহার নিকট দাখিল করিতে বলিলেন। তিনি মাসিক কিস্তি হিসাবে তাহাদের কিছু কিছু করিয়া দিয়া দেনা পরিশোধ করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে শিশিরের আর ভয়ের কোনও কারণ থাকিবে না ; কিন্তু তিনি এই সর্ত্তে তাহার এই দেনা পরিশোধ করিতে সম্মত হইলেন যে, শিশির ভবিষ্যতে আর এক পয়সাও কাহারও নিকট ধার করিবে না।

এই প্রস্তাবেই শিশিরকে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইতে হইল। কিন্তু তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল, টাকাটা নিজের হাতে লইয়া ইচ্ছামত খরচ করা। সে বিমর্ষ চিত্তে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই শরীরটা বড়ই অবসন্ন বলিয়া তাহার মনে হইল। তাহার ঘরে গুপ্তস্থানে মদ লুক্কায়িত থাকিত। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া মনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য একটু মদ্য পান করিল।

তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাসমূহ কোথায় উড়িয়া গেল। বোতলের অবশিষ্ট মদটুকু পান করিয়া সে স্থির হইতে পারিল না। সন্ধ্যায় ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাজগোজ করিয়া সে চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল।

চপলা ও শিবশঙ্কর বাবু যথাসময়ে সে খবর পাইলেন। তাঁহাদের সে সময়ের মানসিক অবস্থা অনুভব করিলে অতি বড় কঠিন হৃদয়েরও চক্ষুতে জল আসে। তাঁহারা দুইজনেই গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কথা নাই। দুর্ব্বিষহ চিন্তানলে

তাঁহাদের অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, এ অনলে তাঁহাদের একটু একটু করিয়া দগ্ধিয়া মরিতে হইবে, কিছুতেই নিস্তার নাই!



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ আট দশ দিন হইল চপলা সন্দিজ্বরে শয্যাগত। তখন সহরে 'টাইফয়ড' রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব। সহরের জনকতক ইতিপূর্ব্বেই ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। দু'চারজন এখনও শ্বসিতেছে। সহরবাসীরা সকলেই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া আছে। চপলার প্রথম সামান্য সন্দিজ্বরই হয়। তারপর পুত্রের জন্য মানসিক উদ্বেগবশতঃ জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্থানীয় ডাক্তার 'টাইফয়ড' রোগের লক্ষণ সকল স্পষ্ট দেখিয়া ভয় পাইলেন। রোগের সহিত সংগ্রাম করিবার মত দৈহিক সামর্থ্য চপলার ছিল না। তাহার শরীর পূর্ব্ব হইতেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শিবশঙ্কর বাবু কলিকাতায় টেলিগ্রাম করাইয়া সেখান হইতে আজ ডাক্তার আনাইয়াছেন। ইনিও রোগিণীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বড় উৎসাহভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, জীবনের আশা খুবই কম।

চপলা শয্যার উপর শায়িতা। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। শিশির তাহার পাশেই বসিয়া রহিয়াছে। শিবশঙ্কর বাবু ও ললিত শয্যার উপর অদূরেই বসিয়া রহিয়াছেন। ডাক্তারেরা মধ্যে মধ্যে ঘরের

ভিতর আসিয়া রোগিণীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া যাইতেছেন, যতই বেলা অগ্রসর হইতেছে, তাঁহারা ততই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। জীবন-প্রদীপ দ্রুত নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া আসিতেছে। মুমূর্ষুর মনে এ সময় নানা ভাবের উদয় হইতেছে। এখন আবার গোড়া হইতে নূতন ভাবে জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা তাহার মনের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠিতেছে। কৃত কার্য্যের জন্য সে এখন বড় অনুতপ্ত। বিবাহের পর হইতে একদিনও সে মনে নির্ম্মল শান্তি ও প্রকৃত সুখ অনুভব করে নাই। একদিনের জন্যও ললিত ও সুরমাকে সে নিজের ছেলের মত ভাবিয়া আদর করিতে পারে নাই, অথচ অতি-রিক্ত আদর দিয়া নিজের ছেলের সে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। প্রথম সে ললিতের হাত ধরিয়া বলিল,—"বাবা তোমার প্রতি অনেক অন্যায় করেছি। দোষ করলেও মা বলে আমাকে ক্ষমা করো।" কিন্তু শিশিরের সহিত কথা কহিবার সময় তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিলে অতি বড় পাষাণের হৃদয়ও বিগলিত হয়। সে দৃশ্য যাহার মনে একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, সারাজীবনেও সে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না, সে সময় যে শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে সমস্ত জীবনের অর্জ্জিত শিক্ষাও তাহার তুলনায় কিছুই নহে। চপলা তাহার শীর্ণ ডান হস্তখানি শিশিরের মাথার উপর রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবা, আমি ত চল্লাম, জানি মারই শিক্ষার দোষে

আজ তোমার এ অবস্থা, তাই আবার আমার বাঁচতে সাধ হয়, তোমাকে গোড়া থেকে একবার সুশিক্ষা দিই ; আমি তোমার সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দের দিকেই সর্ব্বদা নজর রেখেছিলাম, তোমাকে যথার্থ মানুষ গড়ে তুলতে চেষ্টা করি নি। আজ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ জীবনের পরেও একটা জীবন আছে, সেখানে যারা কেবল এই সংসারেরই চিন্তা করে, তাদের প্রবেশ নিষেধ। হায়, যদি তোমার পাপের বোঝাও আজ আমি ভগবানের চরণতলে বয়ে নিয়ে গিয়ে তার শাস্তি নিতে পারতাম, তাহলে আজ আমার মরণ বড় সুখের হত! কিন্তু এখনও সময় আছে, সাবধান হতে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফল হবে। আমি ত মরতে বসেছি, তোমার নিকট আমার এই শেষ ভিক্ষা।"

চপলা সত্য কথাই বলিয়াছিল। সেই স্বহস্তে পুত্রের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, আর সেই পুত্রই আজ তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ!

শেষে স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া "শিশিরকে দেখ" বলিতে বলিতে চপলা চিরতরে চক্ষু মুদিল। শিশির বড়ই কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। শিবশঙ্কর বাবু গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। ললিত কাঁদিতে কাঁদিতে শিশিরকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। শ্মশান-ঘাটেরও দৃশ্য বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। শব বহন করিবার পূর্ব্বে শরীর বড় দুর্ব্বল বলিয়া শিশিরকে বাধ্য হইয়া একটু মদ পান করিয়া লইতে হইয়াছিল। চিতা সাজাইয়া

পরে অগ্নিসংযোগ করিতেই শিশির ফুপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আগুনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। ললিত জোর করিয়া তাহাকে না ধরিলে, বোধ হয় সেই চিতানলেই তাহারও পাপ জীবন ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

মাতার মৃত্যুর পর শিশির প্রথম যেন একটু সৎপথে আসিতে চেষ্টা করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। মদ খাইয়া তাহাকে উন্মত্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে আর কেহ দেখিতে পাইত না। বদ্ অভ্যাসসমূহ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারিলেও পান-বিষয়ে সে অনেকটা সংযত হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বড় আর সে বাড়ীর বাহির হইত না। দু'চার দিন এই ভাবেই কাটিল। তাহার পর সে আবার একটু একটু করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পর শিবশঙ্কর বাবু নিজের ঘরে বসিয়া অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছিলেন। চপলার মৃত্যুতে বাহ্যতঃ তিনি কোন প্রকার অধৈর্য্য প্রকাশ না করিলেও, প্রৌঢ় বয়সে বিপত্নীক হওয়ায় তিনি যে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হঠাৎ ঝনাৎ করিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল। তিনি চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন শিশির টলিতে টলিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন তাহার ঘাড়ে আবার পুরাতন ভূত চাপিয়াছে। ভগবান যদি আঁতুড়েই ইহার জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহই দেখান হইত। শিশির স্খলিত

পদবিক্ষেপে ও কম্পিত দেহে পিতার সম্মুখীন হইল। তাহার মাথার চুল রুক্ষ, তাহার ভাব-ভঙ্গী বড় ভীতিসঞ্চারক। সে অস্পষ্টভাবে শিবশঙ্কর বাবুকে কি বলিল, তাহা সব সম্যক বোধ-গম্য না হইলেও তিনি এটুকু বেশ বুঝিতে পারিলেন, গুণধর পুত্র আবার অর্থের তাগিদা করিতে আসিয়াছে।

শিবশঙ্কর বাবু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার দিকে হতাশ ভাবে তাকাইয়া বলিলেন,—"শিশির, এই কি ভাল হবার প্রতিজ্ঞার ফল নাকি? যাও, এখন এখান থেকে যাও, পরে মাথা ঠিক হলে এসো।"

শিশির চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমার টাকা চাই-ই। আপনার কি ক্ষমতা আছে যে আমাকে টাকা দেবেন না? আমি বলে রাখছি, টাকা আমার চাই-ই। কোনও আপত্তি শুনতে চাই না।"

শান্তপ্রকৃতি শিবশঙ্কর বাবুও পুত্রের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া রাগিয়া গেলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"টাকা না দেবার অধিকার আমার আছে। সে অধিকার যদি ক বছর আগে থেকেই আমি চালনা করতাম তাহলে আজ তুমি এমন গোঁয়ার গোবিন্দ হয়ে উঠতে পারতে না।"

শিশির কি করিতেছে, বোধ হয় হতভাগ্য যুবক নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। সে চীৎকার করিতে করিতে শিবশঙ্কর বাবুকে রূঢ় কথা বলিতে লাগিল এবং হঠাৎ তাঁহার রগে এক ঘুসি

বসাইয়া দিল। শিবশঙ্কর বাবু সে আঘাতের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পাশের ঘরেই ললিত বসিয়া বই পড়িতেছিল। সে শব্দ শুনিয়াই দৌড়িয়া আসিল। শিশিরকে সরাইয়া দিয়া সে পিতাকে তুলিয়া ধরিল। শিবশঙ্কর বাবুর মাথার একধারটা মেজেতে লাগিয়া একটু কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। ললিত জল আনিয়া তাহা মুছাইয়া দিল।

শিশির একপাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। ললিত তাহার দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন,—"না ললিত ওকে কিছু বলো না। ওকে যথাসর্ব্বস্ব দাও, ও মদ খেয়ে উড়িয়ে দিক্। চল, আমরা পথে পথে ভিক্ষে করে প্রাণ ধারণ করবো। এ বয়সে ছেলের হাতে এ লাঞ্ছনা ভোগ আর সহ্য হয় না!"

শিবশঙ্কর বাবু প্রকৃতিস্থ হইলে ললিত হরির সাহায্যে শিশিরকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল; কিন্তু সারারাত্রি সে অশান্ত প্রেতাত্মার ন্যায় চঞ্চল ভাবে বাড়ীর উপর নীচে ঘুরিয়া বেড়াইল, একতিল শান্ত হইতে পারিল না। উন্মাদের সকল লক্ষণই তাহাতে স্পষ্ট লক্ষিত হইল। ললিত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে শান্ত করাইতে পারিল না। এমন কি শিবশঙ্কর বাবু নিজেও মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে স্থির হইয়া ঘুমাইবার জন্য কত অনুনয়-

বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। সে চীৎকার করিয়া, গান গাহিয়া রাতটা কাটাইয়া দিল। হরি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল।

ভোরের বেলা সে একটু প্রকৃতিস্থ হইল। ললিত তখন তাহাকে একটু ঘুমাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সে তখন ললিতের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"দাদা আমি মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে গেছলাম, আমার কিছু জ্ঞান ছিল না। তোমরা কি আমার দোষ ক্ষমা করবে না? বাবাকে বুঝিয়ে বল, দাদা।"

"তোমার সব দোষ তিনি ক্ষমা করেছেন। তুমি ত আর জ্ঞানে ও কাজ কর নি! এখন চুপ করে একটু ঘুমোও।"

শিশির বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না। পরে শান্ত হইয়া সে চোখ বুঝিল। সে যথার্থই ঘুমাইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য ললিত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল; কিন্তু তাহাকে আর নড়িতে চড়িতে না দেখিয়া ঘুমাইয়াছেই স্থির করিয়া ললিত বাহির হইয়া আসিল; হরি পূর্ব্বেই সে ঘর ত্যাগ করিয়াছিল।

বসাইয়া দিল।

না পারিয়া

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরে

সকাল বেলাটা কোনও প্রকারে একরকম কাটিয়া গেল। শিশির অনেকটা স্থির হইয়া শুইয়াছিল। ডাক্তার বাবু আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গেলেন, ভয়ের কোনও কারণ নাই ; কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার উন্মত্ততাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তুপুর একটার সময় শিবশঙ্কর বাবু লক্ষ্য করিলেন, শিশির উঠিয়া জুতাপায়ে ঘরের ভিতর চঞ্চলভাবে পায়চারি করিতেছে, দেওয়ালের উপর তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। চক্ষুর তারা দু'টো বিস্তৃত, তাহার মুখে একটা যেন ভীতিপ্রদ ভাব অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। পরক্ষণেই সে ভুল বকিতে আরম্ভ করিল। শিবশঙ্কর বাবু ভয় পাইয়া ললিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ললিত ঘরে ঢুকিবামাত্র শিশির ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল,— "ঐ দেখ।"

"কি দেখবো ?"

"দেখ, কি কালো! বেড়ালটা ওখানে আগে তুবার এসেছিলো। ওটাকে তাড়িয়ে দাও, দাদা ওটাকে তাড়িয়ে দাও।"

শিশির করুণভাবে এই কথাগুলি বলিল। ললিত শিশিরের প্রদর্শিত স্থানে অগ্রসর হইয়া সেখানে সজোরে পদাঘাত করিয়া

বলিল,—"কই, শিশির, এখানে ত কিছুই নেই, জনপ্রাণীও নেই? আচ্ছা, চেয়ারটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি, এই দেখ, কিছুই নেই।"

শিশিরের রক্ত চক্ষুর্দ্বয় ঘরের চারিদিকে ঘুরিতেছিল, বিছানার উপরে ও তলদেশে, দেওয়ালের গাত্রে, ঘরের ছাদে, যেন তাহার চঞ্চল দৃষ্টি চলন্ত কোনও জিনিষের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। ললিত বলিল,—"শিশির, বিছানায় শোও দিকি, সব ঠিক হয়ে যাবে। এস শোবে এস। আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি।"

ললিত তাহার হাত ধরিল। শিশিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ অসাধারণ ভাবে কম্পিত হইতেছিল।

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি শুচ্ছি; তুমি ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন।" কিন্তু বিছানার নিকট যাওয়া পরের কথা বরং সে আরও দূরে সরিয়া গেল। ললিত তাহাকে ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিল। একটুখানি আসিয়া শিশির আবার হঠাৎ থামিয়া গেল।

সে চুপি চুপি ললিতকে বলিল,—"ঐ দেখ এবার বিছানার উপর, গায়ে কি বিশ্রী কালো দাগ!"

এই বলিয়া সে লাফাইয়া ললিতের হাত ছাড়াইয়া একেবারে ঘরের বাহিরে গিয়া হাজির হইল। যথাসময়ে হরি আসিয়া সিঁড়ির উপর তাহাকে না ধরিলে, ললিত বাহিরে আসিবার

পূর্ব্বেই সে একেবারে রাস্তায় গিয়া হাজির হইত। ললিত পুনর্ব্বার তাহাকে ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিল এবং হরিকে ডাক্তার বাবুর নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইল।

ললিত তাহাকে বিছানার দিকে টানিয়া আনিল। সে কাতরভাবে বলিয়া উঠিল,—"না, ওখানে যেতে পারবো না, বেড়ালগুলো বিছানার ভেতর লুকিয়ে আছে! বাবা, কি মোটা ল্যাজ! ঐ একটা মুখ বাড়াচ্ছে! দেখ, দেখ, ওরা যমের দূত, যমরাজাও এলো বলে!"

শিবশঙ্কর বাবু বিছানার চাদর তুলিয়া ঝাড়িয়া দেখাইলেন, কোথাও কিছুই নাই। তিনি বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে শিশিরকে বলিলেন,—"কই বাবা, কিছুই ত নেই। ওটা তোমার মনের ভুল।"

এমন সময় ডাক্তার বাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া শিবশঙ্কর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি? গত রাত্রের মত নাকি? ভুলও বকছে দেখছি যে।"

শিশির ডাক্তার বাবুর দিকে তাকাইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"ডাক্তার বাবু, ঐ বেড়ালগুলোকে সরিয়ে দিন না। এরা পারছে না।"

"তার আর কি, আমি দিচ্ছি। তুমি শুয়ে পড়। ও কি, জুতো পায়ে বিছানায় উঠছো কেন? জুতো খুলে ফেল। ও দুটো আমাকে দাও। বেড়ালদের ঐ দিয়ে মেরে তাড়াতে হবে।"

সুশীল বালকের ন্যায় শিশির ডাক্তার বাবুর কথামত জুতা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ডাক্তার বাবু সঙ্গে করিয়া একটা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া ঘুমাইতে বলিলেন। পরে ললিতকে একপাশে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—"জুতো দুটো সরিয়ে রাখ। জুতো না পরতে পেলে পাগলেরা কিছুতেই বাইরে বেরোবে না। জুতো পরলেই পালাবার সুযোগ খুঁজবে। সে একবারে উলঙ্গ হয়ে থাকলেও কোন বাধা ঠেকবে না। ব্যাপার বড় সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে না।"

ললিত উদ্বিগ্নভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কি রোগীর অবস্থা খারাপ বলে সন্দেহ হচ্ছে?"

"দেখ, আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে এ আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া বড় শক্ত হবে। অতিরিক্ত মদ খাবার ফল এই। আমি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আধ ঘণ্টা পরে খাইয়ে দেবে। আমি রাত্রে আবার আসবো।"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। তিনি যতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন, শিশির স্থিরভাবে বিছানার উপর শুইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াই সে আবার পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। ললিতের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"দাদা আমার জুতো দাও।"

"এখন জুতো কি হবে?"

"আমার চারদিকে বিছানার উপর সেগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি এ ঘরে থাকতে পারছি না, বাইরে যাবো।"

"না, আজ আর নয়। কাল সকালে বেরুবে এখন।"

"না আমি যাবই, আমার জুতো দাও।"

ললিত আর কোনও উত্তর করিল না। শিশিরও সে বিষয় ভুলিয়া গিয়া অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপনা করিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক রকমে কাটিল; কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতেই রোগীর অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ হইল। যে জীবন এতদিন তাহার নিজের নিকটও কেবল একটা মস্ত ভার বলিয়া বোধ হইত, তাহার পরমায়ু প্রায় ফুরাইয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে তাহার সমস্ত দেহ এমন ভীষণভাবে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল যে, সে স্পন্দনে ঘরের মেজে অবধি নড়িয়া উঠিত, খাটের মশারি ও বিছানার চাদর বৃক্ষপত্রের ন্যায় কম্পিত হইত।

তাহার অবস্থা দেখিয়া শিবশঙ্কর বাবু বড়ই ভীত হইলেন। শিশিরের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও প্রখর বুদ্ধির কথা তাঁহার মনে পড়িল, উহার সহিত তাহার বর্ত্তমন অবস্থার কত পার্থক্য! তিনি তাহার পাশে অগ্রসর হইয়া স্নেহভরে তাহার হাত ধরিলেন।

"শিশির, আমাকে চিনতে পারছো না? এই যে আমি তোমার বাবা।"

সে একবার এদিকে একবার ওদিকে অনবরত মাথা নাড়িতে নাড়িতে চেঁচাইয়া বলিল,—"ঐ সব বিছানার ওপর

উঠছে,—হাজার হাজার। ও সব শয়তান, যমের
বাবা, কি বিশ্রী চেহারা! ঐ দেখ, একটা পা ধরে টান
সরে যা।" এই বলিয়া সে পা দিয়া বিছানাতে একটা জো
আঘাত করিল। শিবশঙ্কর বাবুর অশ্রুবেগ কিছুতেই রোধ মানিল না।

ইতিমধ্যে ডাক্তার বাবু আসিয়া তাহার মাথায় বরফের ব্যাগ বসাইয়া দিলেন। শিশির একটু ঠাণ্ডা অনুভব করিল। পরে ডাক্তার বাবুর দিকে তাকাইয়া সহজভাবেই বলিতে লাগিল,—"শুনেছেন, দাদা হঠাৎ মারা গেছে? আমাদের কারবার আর চলবে না। দাদা পথে মারামারি করে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল। লোকেরা ধরাধরি করে বাড়ীতে তুলে আনে! মাথাটা একেবারে ফেটে গেছলো। তাতে কি আর কেউ বাঁচে?"

হতভাগ্য যুবক! তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক কি অপরূপ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আলোড়িত হইতেছিল!

ডাক্তার বাবু যদি অপরিচিত লোক হইতেন, তাহা হইলে শিশিরের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর হইতে তিনি নিশ্চয়ই স্থির করিতেন, ললিতের মৃত্যুঘটনা সে নিজচক্ষে দেখিয়াছে। শিশিরের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে দেখিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। শিশির কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে স্থির হইয়া বিছানায় শুইয়া রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ "ঐ রে বাবা ধরলে" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেগে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উপ-

তাহাকে ধরিয়া বসাইতে পারিল না। উন্মাদের ীম বলের সঞ্চার হয়। সে প্রায় উলঙ্গ হইয়া সকলের হত ঝটাপটি করিতে লাগিল, তাহাদের বন্ধনমুক্ত হইবার চেষ্টা! পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তার বাবুর পরামর্শ মত ঘরের জানালা সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ছুরি, কাঁচি, খুর প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

সে রাত্রি এই ভাবেই কাটিল। শিশির কখনও বা মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইতেছে, কখনও ভীষণ উন্মত্তভাবে চীৎকার করিতেছে। সেই সব ভীষণাকার ছায়ামূর্ত্তি অনবরত তাহার চক্ষের সম্মুখে উদিত হইতেছে। তাহার এলোমেলো অসংলগ্ন কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেরই চোখ ফাটিয়া জল পড়িয়াছিল। এ রোগের ইহাই লক্ষণ। দিনরাত সেই সব ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি নানারূপ আকার ধারণ করিয়া দলে দলে একবার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিছুক্ষণ পরেই অদৃশ্য হইতেছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই পুনঃপ্রবেশ করিয়া ঘরের আসবাব, বিছানা ও জিনিষ-পত্র সব তোলপাড় করিতেছে; সবাই যেন তাহার দিকে তাকাইয়া বিকৃত মুখভঙ্গী ও উপহাস করিতেছে। এ সব সহজ অবস্থার লোকের ধারণার বাহিরে। যাহারা হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত হইয়া এরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জানে যে, একদিন এই বিষম ব্যাধি তাহাদের আক্রমণ করিবে,

কিংবা অল্প অল্প আক্রমণ করিয়াছে, যে ইহাই সম্ভবতঃ একদিন তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইবে। তথাপি এই আসন্ন বিপদের হাত হইতে উদ্ধার-লাভের তাহারা কোন উপায় অবলম্বন করে না। শিশিরও তাহা জানিত। মধ্যে মধ্যে তাহার মনের মধ্যে ক্ষীণ আশার আলোক মিটিমিটি করিয়া জ্বলিত, সেও প্রতিজ্ঞা করিত, ভাবিত একদিন এই পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া সে সত্য ও ন্যায়ের পূজা করিতে সমর্থ হইবে। একদিন—ঐ কথাটাই বড় সাংঘাতিক! বর্ত্তমানে নহে, ভবিষ্যতে। সারারাত্রি অতিরিক্ত মদ্যপানে অতিবাহিত করিয়া প্রাতে উঠিয়া সে সমস্ত দেহে ভীষণ ব্যথা অনুভব করিত। কিন্তু ও সমস্ত দৈহিক যন্ত্রণা তাহার মানসিক কষ্ট ও অশান্তি-ভোগের তুলনায় কিছুই নহে। সে বুঝিত শীঘ্রই এ দু'কুড়ি সাতের খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহাকে পৃথিবীর মায়া কাটাইতে হইবে,—তখন, তখন,—! সে আর ভাবিতে পারিত না, তাহার মাথা ঘুরিত।

রাত্রি প্রভাত হইল। শিশিরের জীবনের ইহাই শেষ দিন। সে পূর্ব্বের ন্যায় ভুল বকিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক আধ-মুহূর্ত্ত স্থির হইত, কিন্তু তাহাকে ঠিক বিশ্রাম বলা যাইতে পারে না। কারণ তখন কম্পজ্বরের ন্যায় তাহার সমস্ত দেহ ঘনঘন কাঁপিতে থাকিত। মনের গতি সম্পূর্ণই এলোমেলো; কিন্তু তাহার মধ্যেও তাহার বিগত জীবনের স্মৃতি ও বর্ত্তমান দুঃখ-কষ্টের সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইত।

দুপুর বেলা শিশির ললিতের দিকে তাকাইয়া কাতরভাবে বলিল,—"দেখতে পাচ্ছো, আমাকে ধরে রেখেছে, কিন্তু আমি বাইরে যেতে চাই। এই যে, বাবা এখানে বসে আছেন?"

এই বলিয়া শিশির তাহার দৃষ্টি পিতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল,—"ভালই হয়েছে। আপনাকে দুটো কথা বলতে চেয়েছিলাম। মাথাটা বড় গরম হয়েছে। ঐ আবার দলে দলে সব আসছে; আমি মরি কি বাঁচি, তোদের সে খোঁজে দরকার কি?" এই বলিয়া সে তাহার কম্পিত জীর্ণ হস্তখানি পিতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"বাবা, আপনি কি মনে করেন, আমি মরবো?"

এ প্রশ্নে শিবশঙ্কর বাবু বড়ই বিচলিত হইলেন। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার উত্তর দিবারই বা কি আছে?

শিশির নিজেই আবার সজোরে বলিতে লাগিল,—"না, না, এখন নয়। দয়া, দয়া। একবিন্দু অনুগ্রহ! ভাল হবার জন্যে কিছুদিন সময় চাই। মদের বোতল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও বলছি। আমি অনেক পাপ করেছি, আর এক ফোঁটাও মদ ছোঁব না। ওঃ! এখানটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে!" এই বলিয়া সে নিজের বক্ষঃস্থল দেখাইয়া দিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার আরম্ভ করিল,—"রাত্রে ওরা সব আমাকে এসে বল্লে, আমি আর বাঁচবো না। কিন্তু সে কথা

সত্যি নয়। আমার এখন মরা হতেই পারে না, অনেক কাজ জড় হয়ে গেছে। সে সব না সেরে আমি কি মরতে পারি? আমি যে এতদিন কোন কাজই করি নি,—কেবল মদ খেয়ে বেড়িয়েছি। এই যমদূতগুলোকে আমার কাছে আসতে দিও না। ভয় নেই, আমি মরবো না। ভগবানকে বলেছি, আমাকে আরও কিছু দিন সময় দিতে। আমি আমার প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখবো, সব অভ্যাস ছেড়ে দেব। ঐ শোন, শয়তানগুলো আবার শব্দ করছে। চুপ বদমায়েস! আবার কাছে আস্‌ছিস্? দূর হয়ে যা। সমস্ত ঘর যে ভর্ত্তি হয়ে গেল!"

এই বলিয়া সে আবার উঠিতে চেষ্টা করিল। ডাক্তার বাবু ও ললিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সে আর নড়িতে পারিল না বটে, কিন্তু ভীষণ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার বেগে তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পন্দিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া সে আবার বলিতে লাগিল,—"দাদা, একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখছিলাম,—আমি যেন কেবল মদ খেয়ে জীবনের দিনগুলো বৃথা কাটিয়েছি। এ কথা কে বলে? সব মিথ্যে! ঐ কালো কালো ভূতের মত চেহারা, লোকগুলকে দূর করে দাও। আমাকে পাগল করে দিবি, তোদের এত সাহস? তোরা কি জানিস্ আমিই আমার সময়ের কর্ত্তা? একটা বলছে, আমার মহামূল্য সময় আমি সব নষ্ট করে ফেলেছি। আমাকে এত বড় কথা বলে, ওর স্পর্দ্ধা কম নয় ত! আর কিছুদিন সময়, ভগবান, দয়া

করে আর কিছুদিন সময় আমাকে দাও। আমি ত আজ মদ ছুঁই নি। আর ছোঁবনা বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। বাবা ঐ যম-দূতগুলোকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিন। একে পাপের ভারে আমার কাঁধ নুয়ে পড়েছে, আবার ওগুলোকে আমার কাছে কেন আসতে দিচ্ছ? আমাকে তুলে ধর! সব তাড়িয়ে দাও। আমি কিছুতেই মরতে পারবো না। সময় পেলাম না? ভগবানের দয়া হল না!"

শিশির তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপকে আরও কিছু-দিনের জন্য প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্য যথার্থই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিল। হায় পূর্ব্বে বহু সুযোগই সে পাইয়া-ছিল, কিন্তু সবই অপব্যবহার করিয়াছে! লক্ষ্মীস্বরূপিনী প্রথম স্ত্রী অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। চপলাও নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া ভবখেলা সাঙ্গ করিয়াছে। স্নেহের পুত্র আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত! তাহার অবস্থা দেখিলে শত্রুরও চোখে জল ঝরে। শিশির তাহার সারাজীবনে একটাও ভাল কাজ করি-য়াছে কিনা সন্দেহ। জীবনের মহামূল্য সময়ের একঘণ্টাও সে কোনও সৎকার্য্যে অতিবাহিত করে নাই। তাহার সবল দেহ, বিদ্যাবুদ্ধি, সমস্তই সেই উচ্ছৃঙ্খলতারূপ মহাপাপের বেদীতলে সে উৎসর্গ করিয়াছে! এই সব ভাবিয়া শিবশঙ্কর বাবুর অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আপনি

আর এখানে বসবেন না, বাইরে যান। এ দৃশ্য আপনার পক্ষে অসহ্য।”

শিবশঙ্কর বাবু কম্পিত হস্তে ডাক্তার বাবুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“ডাক্তার বাবু, আমারও আর এ সংসারে বেশী দিন স্থান হবে না। এখন কথা হচ্ছে, ও আগে যাবে, না আমি আগে যাবো। আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেছে!”

শিশিরের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। সে কিছুক্ষণ একটু শান্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। শেষে চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যথিত আত্মা যেখান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেইখানেই চলিয়া গেল। শিবশঙ্কর বাবু গম্ভীর ভাবে মৃত পুত্রের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু একেবারে জলশূন্য। ডাক্তার বাবু স্থির করিলেন, এ শোকের বেগ কাটাইয়া তাঁহাকে আর বেশী দিন বাঁচিতে হইবে না।

পাঠক! যদি কখন প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সুরাপানের নেশা তোমাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে, এই হতভাগ্য যুবকের জীবনী যেন তোমাকে তাহা হইতে সতর্ক করিয়া দিতে পারে! এ ঘটনা কল্পিত গল্প বলিয়া বিবেচনা করিও না, ইহা কোনও সম্ভ্রান্তবংশের ইতিহাস হইতে গৃহীত। সুরাপূর্ণ পান-পাত্রের দিকে কখনও লুব্ধ নয়নে তাকাইও না। যদি ইহ-লোকে ও পরলোকে সুখ-শান্তি লাভ করিতে চাও, সর্ব্বদা ইহা হইতে দূরে থাকিও।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শিশিরের মৃত্যুর পর আজ প্রায় একমাস অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে। শিবশঙ্কর বাবু ধৈর্য্যসহকারে পুত্রশোক সহ্য করিলেও সংসারের প্রতি তাঁহার কি রকম একটা বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কারবারের কাজকর্ম্ম তিনি আর আদৌ পরিদর্শন করিতে পারেন না, সুযোগ্য পুত্র ললিতের হাতেই তাহার পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারও শেষের সে ভয়ঙ্কর দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, জীবনাবসানে আয়ুঃসূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, মৃত্যুর অন্ধকাররাশি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। তবে তাঁহার এখনও একটি কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিয়াছে। ললিতকে সংসারী দেখিয়া যাইতেই হইবে। ইতিপূর্ব্বে ললিতের বিবাহ দিবার আশায় তিনি ললিতের নিকট এ প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, কিন্তু ললিত সে বার তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ও সংসারে উপর্য্যুপরি নানা আপদ-বিপদ ঘটায়, তিনি ললিতকে এ বিষয়ে আর কোনও কথা বলেন নাই। কিন্তু এখন ভাবিলেন, ললিতের বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিতে পারিলে তিনিও নিশ্চিন্ত মনে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে পারিবেন,

আর যে কয়দিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবেন, তাঁহার মনের অশান্তিরও অনেকটা লাঘব হইতে পারে!

তিনি পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া শুভদিনে ললিতের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বিবাহে ললিতের ততটা আগ্রহ ছিল না, কারণ তাহার জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে; তত্রাচ শোকাভিভূত পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবার সে আর কোনও আপত্তি করে নাই। পিতা যে আর বেশী দিন বাঁচিবেন না, তাঁহার গণা দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। এ সময় পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করিয়া তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট করিতে ললিতের প্রাণ চাহিল না। পিতার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া এবং সম্ভবপর হইলে তাঁহার জীবনের মাত্রাকে আরও কিছুদিন বাড়াইয়া দিবার ব্যর্থ আশায় সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। শিবশঙ্কর বাবুর পুত্রবধূর নাম ইন্দিরা। ইন্দিরা যে কেবল নামে ও রূপলাবণ্যেই লক্ষ্মীর অনুরূপ তাহা নহে, সে নিজের দয়া ও স্নেহের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই সকলকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিল। শিবশঙ্কর বাবুর শুষ্ক উদ্যানের নির্জীব লতাসমূহ আবার নব পত্র-পুষ্পে মুকুলিত হইয়া উঠিল!

*　　　*　　　*

রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া মিত্রদের বাড়ীতে হঠাৎ

ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবেরা সব আসিয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল। শিবশঙ্কর বাবু আজ তিনদিন যাবৎ জ্বর ও আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন। আজ বিকালেও রোগীর অবস্থা এত খারাপ বলিয়া কেহ সন্দেহ করে নাই। সন্ধ্যার পর হইতেই ইহা ভিন্ন আকার ধারণ করে। রাত্রি আট ঘটিকার সময় পুত্র ও পুত্রবধূর নিকট বিদায় লইয়া, নাতি-নাতিনীর মুখ দেখিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শিবশঙ্কর বাবু সজ্ঞানে হরিনাম জপিতে জপিতে চক্ষু মুদ্রিত করেন। তাঁহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট তাপিত প্রাণ শীতল হইল!

প্রতীবেশীরা ও কলের লোকজনেরা সকলেই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া যথার্থই দুঃখিত হইল। এমন পরোপকারী সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেশী, এমন সহৃদয় প্রভু সংসারে বড় বিরল। তবে পিতার যোগ্য পুত্র ললিতের নির্ম্মল স্বভাব-চরিত্রের কথা ভাবিয়া তাহারা অনেকটা শান্ত হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শ্মশান-ঘাট পর্য্যন্ত শবের অনুসরণ করিয়াছিল এবং সৎকারাদি শেষ হইলে তবে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। যে স্থানে অন্নপূর্ণার পবিত্র-দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই একই চিতায় শিবশঙ্কর বাবুর শব-দাহন কার্য্য সমাধা হইল। ললিত পিতার মৃত্যুতে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুরমা পিতার অসুখের সংবাদ পাইয়াই সুধীরের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং তিনি সুস্থ না হওয়ায় বাড়ী ফিরিতে পারে নাই। সুধীর

ললিতকে সান্ত্বনা দিয়া শ্মশান-ঘাট হইতে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল।.

ললিতের অনুরোধে সুধীর ও সুরমা আরও কিছুদিন সেখানে থাকিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। ললিত তাহাদের নিকট শিশিরের মৃত্যুঘটনা বর্ণনা করিল। পরে সুধীরের হাত ধরিয়া বলিল,—"ভাই, যারা মদ খায়, তাদের যেন এই শুনেই চৈতন্য হয়। তুমি আর সেই থেকে বোধ হয় ও পাপ ছোঁও না?" সুধীর ইন্দ্রিয়জয়ের বিজয়-গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল,—"না ভাই, আর কোনও ভাবনা নেই। আমি ভগবানের অনুগ্রহে সম্পূর্ণ আত্মজয় করেছি।" সে রাত্রে সুরমা সুধীরের বুকের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল। তাহার স্বামীও যদি প্রলোভন-দমনে অসমর্থ হইয়া শেষে শিশিরের মত অবস্থায় পরিণত হইত! সুধীর তাহার মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুরমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "না সুরমা, আর কোনও ভয় নেই।" পরে স্বামী-স্ত্রীতে দুইজনেই করজোড়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যেন, সুধীরের এ মনের জোর শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় থাকে, সে আর পদস্খলিত না হয়! আরও কিছুদিন সেখানে থাকিয়া ললিত একটু শান্ত হইয়া কাজে মন দিলে সুধীর সস্ত্রীক কলিকাতা চলিয়া আসিল।

সেদিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পূর্ণশশী নীলনভে উদিত হইয়া ধবল রজতধারায় ক্ষুদ্র গ্রামটিকে স্নাত করিয়া দিয়াছে! ললিত

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মাথাটাও একটু ঘুরিতেছিল। সে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পথে বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। শনিবারের রাত্রি। মদের দোকানের সম্মুখে আসিয়া ললিত দেখিল, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, এমনকি কিশোরবয়স্ক বালক পর্য্যন্ত দলে দলে দোকানের ভিতর ঢুকিতেছে ও স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে মদ খাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ললিত দোকানের ভিতর বিশেষ ভাবে নজর করিয়া লক্ষ্য করিল, তাহার কলের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই দোকানের ভিতর বসিয়া মদ খাইতেছে। আজ তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়াছে। তাহাদের স্ফূর্ত্তি তখন আর দেখে কে? কাহারও কাহারও অভিভাবক করুণ স্বরে তাহাদের অনুনয়-বিনয় করিতেছে, যেন সবই বেতন তাহারা মদ খাইয়া না উড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আগামী সপ্তাহে অনাহারে তাহাদের দিন কাটাইতে হইবে। তাহারা সে কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সঙ্গীদের সহিত উচ্চকণ্ঠে রসকথা ও স্ফূর্ত্তি চালাইতেছে।

এ দৃশ্যে ললিতের কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল। ললিত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। একজন কর্ম্মচারী মদ্যপানে তাহার বেতনের অধিকাংশ ভাগই উড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ললিত তাহাকে পথে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, এ বদ্ অভ্যাস কেন? অর্থ নষ্ট, শরীর নষ্ট। কেন

বাড়ীতে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে সাধ যায় না? মদ খেতে এত ফূর্ত্তি?”

লোকটা ধরা পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। পরে ললিত তাহাকে পুনর্ব্বার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কাতর ভাবে বলিল,—“বাবু, বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না। কেবল নাই, নাই শব্দ। চারদিক থেকে অভাবগুলো যেন হাঁ করে গিলতে আসে। তার ওপর ছেলে মেয়ের কান্না, স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য হয় না। আজ্ঞে, আমি বেশী খাই না, এই এক আধ গ্লাস।”

ললিত তাহাকে আর কিছু না বলিয়া নদীর তীরের দিকে অগ্রসর হইল। ঘাটের উপর গিয়া সে বসিল। রাত্রি প্রশান্ত, প্রকৃতিদেবী শ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন। চন্দ্রালোক উজ্জ্বল নদীতরঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম হইতে কত আপদ-বিপদ উৎপন্ন হইতে পারে, ললিতের চিন্তাস্রোত স্বতঃই সেইদিকে ধাবিত হইল। নিজেদেরই সর্ব্বনাশের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শ্যামা দাসী আফিমের মাত্রা চড়াইয়া ঔষধের পরিবর্ত্তে খুকীকে বিষ খাওয়াইয়া দিল। দরোয়ান মদের নেশায় বেহুঁস হইয়া ফটকের দরজা গাড়ীর উপর ফেলিয়া দিল, তাহাতে তাহার মাতার মৃত্যু ঘটে। শিশিরের অন্যায় ব্যবহারে ও উৎপীড়নে চপলার অকাল মৃত্যু ঘটিল। শিশিরের মৃত্যু-কথা মনে

পড়িতেই ললিত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। পরে পিতাও ভগ্নহৃদয়ে ভবখেলা সাঙ্গ করিলেন।

ললিত ভাবিতে লাগিল, এক সংসারেই ইহা যদি এত কুফল প্রসব করে, তাহলে পৃথিবীর কত ক্ষতিই না ইহা সাধন করিতেছে? শতশত লোক প্রত্যহ এই পাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে, পবিত্র গৃহপ্রাঙ্গণে নারকীয় দৃশ্য অভিনীত হইতেছে! এই ক্ষুদ্র সহরেও আজ রাত্রে এই পাপ অপ্রতিহত গতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে। তাহার কলের লোকেরাও এই পাপের বশীভূত হইয়া দারিদ্র্যের করাল কবলে উৎপীড়িত হইতেছে। তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের দুঃখের সীমা নাই। ইহার সংশোধনের কি কোনও উপায় নাই?

কি উপায়? অনেকেই এ প্রশ্ন অনেকবার মনে মনে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পান নাই। কয়েক বৎসর হইতেই এই পাপের অবাধ গতি রোধ করিবার জন্য অনেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। জনসাধারণকে সংযম শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে সমিতিও গঠিত হইতেছে। তাহারা কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা সমাজের অনেক হিত সাধন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের এখনও অনেক কাজ করিবার আছে। এ পাপ যে সহস্রমস্তক রাক্ষসের ন্যায় সংসারকে রাত্রিদিন উৎখাত করিতেছে!

জ্যোৎস্নালোকিত নদী-ঘাটে বসিয়া ললিতের মনে এই প্রকার নানাচিন্তা উদিত হইতে লাগিল। সে কি চেষ্টা করিয়া তাহাদের এই ক্ষুদ্র সহরে ইহার কোনও প্রতিবিধান করিতে পারে না? তাহারও ত একটা দায়িত্ব-জ্ঞান আছে! তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে এই জ্ঞানটা ললিতের নিকট নিজের অস্তিত্ব অনুভব করাইবার জন্য কেবলই মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। কতলোক তাহার কলে চাকুরি করিয়া জীবনপাত করিতেছে; অবশ্য সেও তাহাদের পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার দিয়া থাকে, কিন্তু সেইখানেই কি তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল? তাহা-দের সুখ-দুঃখের অধীশ্বর সে, তাহারা কি ভাবে জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিতেছে, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা কি তাহার কর্ত্তব্য নহে? এ বদ্ অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে দমন করা তাহার সাধ্যাতীত হইলেও, এ বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা তাহার উচিত ত!

সে সহর হইতে মদের দোকান উঠাইয়া দিতে পারিবে না, কিংবা জোর করিয়াও লোকেদের মদ্যপান হইতে বিরত করা-ইতে পারিবে না। আইনে এ দু'টার কোনটাই টিকিবে না। অসংখ্য মদের দোকানে প্রচুর পরিমাণে মদ্য বিক্রয় হইতেছে। বিক্রেতৃগণ যদি তাহাদের ব্যবসায়ে দেশের কিরূপ অহিত সাধিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত হইয়া তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলেও আবার অন্য লোকে নূতন দোকান

স্থাপিত করিবে। ললিতকুমার যদি এত বড় ধনী হয় যে, পৃথিবীর সকল মদের দোকানই অর্থব্যয়ে ক্রয় করিয়া লইয়া সব দোকান বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাতেও সমাজের কোন উপকার সাধিত হইবে না! সাধারণ লোকের স্বভাব-চরিত্রের আমূল সংশোধন করিতে না পারিলে কোন ফলই দর্শাইবে না। জোর করিয়া তাহাদের বদ অভ্যাস ছাড়াইতে যাওয়া সম্ভবপর নহে। অল্পে অল্পে তাহাদের অতর্কিতে, তাহাদিগকে বহুদিনের এ অভ্যাস-পাশ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তাহাদিগকে নীতি-শিক্ষা দিয়া চিন্তাশীল করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে নিজেদের ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের জন্মায়। মনকে উন্নত করিতে পারিলে স্বভাব যথা সময়ে নিশ্চয়ই তাহার অনুসরণ করিবে!

ললিত উঠিয়া নদীতীরে পায়চারি করিতে করিতে এইসব কথা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে নানা মৎলব উঁকি মারিতে লাগিল। এমন সময় নিকটেই কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে দেখিল, ভৃত্য হরি সম্মুখে দণ্ডায়মান।

"এই যে হরি দা? এমন সময় এখানে?"

"আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। শুনলাম বেড়াতে বেরিয়েছ।"

"কি দরকার?"

"দেখ, কলের শ্যামদাসকে কাজে জবাব দিয়েছ, সে

আমার কাছে এসে বড় কাঁদাকাটি করছে, তাকে আবার কাজে বাহাল করবার জন্যে। না খেতে পেয়ে মরমর হয়েছে। সে বলে যে এমন কাজ আর কখনও করবে না। তার কি করা যায়?"

"সে বড় গুরুতর দোষ করেছে। কিন্তু তার স্ত্রীপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তার দোষ এবার ক্ষমা করা যাক্, হরি দা। তাকে বলো সোমবার থেকে কাজে আসতে।"

"আমিও ভেবেছিলাম, তোমাকে বল্লেই তুমি দয়া করবে। এমন মনিব কজন লোকের আছে! শ্যামদাস বলে মদ খেয়ে তার একেবারে হুঁস ছিল না, তাই এমন কাজ করে ফেলেছে।"

"হরি দা, এই মদই মানুষের সর্ব্বনাশ করছে। তুমি আসবার কিছু আগে আমি সেই বিষয়ই ভাবছিলাম। পথে আসতে আসতে দেখলাম মদের দোকান লোকে ভরে গেছে। আমাদের কলেরও অনেক লোক ঢুকছে। মদ খেয়ে তাদের সপ্তাহের বেতন, দেহের সামর্থ্য ও বিদ্যেবুদ্ধি সবই একসঙ্গে নষ্ট করছে। এ বদ্ অভ্যাস বন্ধ করবার একটা উপায় ভেবে ঠিক করা উচিত, ঠিক করতেই হবে। আমার মনে হয়, এ দায়িত্ব ভার আমারই কাঁধে ঝুলছে।"

"যতই চেষ্টা কর না কেন, এর কোনই প্রতিকার করতে পারবে না। যারা মদ খায় মদের দোকান দেখলেই সেখানে ঢুকবে।"

"এতে যে প্রথম হতেই আমাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে,

তা বেশ বুঝতে পারছি; কিন্তু একবার বিশেষভাবে চেষ্টা করে দেখবো। প্রথম কেবল আমাদের কলের লোকেদের নিয়েই কাজ আরম্ভ করবো।”

“দেখ, কেবল যে তাদেরই দোষ তা নয়। তাদের বাড়ীর মেয়েদেরও দোষ। মানুষ সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যায় বাড়ী গিয়ে যে একটু বিশ্রাম করবে, তার জো নেই। স্ত্রীগুলোও বদ্, ঝগড়াটে, কেবল বিরক্ত করে। বাড়ীতে শান্তি পায় না বলেও অনেকে এই মদ খেতে আরম্ভ করেছে, তাও আমি শুনেছি। তোমার মা যখন বেঁচে ছিলেন, অবসর পেলেই এদের ভাল শিক্ষা দিতেন; নতুন মা এ বিষয়ে আদৌ গ্রাহ্য করতেন না।”

“হরি দা, মদের দোকানের সম্মুখে একজনকে মদ খাবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সেও ঠিক আমাকে এই জবাব দিয়েছিল। তা দেখ, আমি একটা যুক্তি এঁটেছি। তোমার বৌদিদিকে দিয়ে এদের স্ত্রীদেরও স্বভাবের উন্নতি করাতে চেষ্টা করবো। আর হরি দা, তোমাকেও আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করতে হবে। আমি যথাসাধ্য একবার চেষ্টা করে দেখবো, ফল ভগবানের হাতে।”

“তোমার এ বুড়ো হরি দা ত চিরদিনই তোমার পাশে আছে ভাই। তা, রাত হলো, এখন বাড়ী চল। আমি শ্যামদাসকে খবরটা দিয়ে যাই, শুনলে সে হাতে স্বর্গ পাবে!”

হরি শ্যামদাসের বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিল। ললিত চিন্তিত হৃদয়ে ধীর পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সহরের মধ্যস্থলে মদের দোকানের নিকটেই শিবশঙ্কর বাবুর একখানি ছোটখাট বাড়ী ছিল। আজ দিনকতক ধরিয়া ললিত সে বাড়ীখানিকে ভাল করিয়া মেরামত করাইতেছে। সহরে এক অদ্ভুত গুজব রটিয়া গিয়াছে যে, ললিতবাবু ঐ বাড়ী যে ভাড়া দিবার জন্য সংস্কার করিতেছেন, তাহা নহে, তিনি ওখানে এক নূতন মদের দোকান খুলিয়া পুরাতনের সহিত টেক্কা দিবেন।

এ জনরব প্রচারিত হইবামাত্র সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল। যে ললিত এই দুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধে কত না বক্তৃতা করিয়াছে, সেই আবার নিজে দোকান খুলিয়া এই পাপের প্রশ্রয় দিতে উদ্যত! তাহারা স্থির করিল, সংসারে লোক চেনা বড় মুস্কিল, মুখে অনেকে অনেক কথা বলিতে পারে কিন্তু নিজেদের স্বার্থটি তাহারা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চায়।

কলের কর্ম্মচারীরা এ কথা শুনিয়া পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল,—"বাবু মদের দোকান খুলবেন? তিনি যে আমাদের মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে কত সৎ পরামর্শ দিয়েছেন!"

ইহার সরল অর্থ কাহারও নিকট বোধগম্য হইল না। এ নূতন বাড়ী যে ভাড়া দেওয়া হইবে না, তাহা সত্য। কারণ

অনেকে ইহা ভাড়া লইবার জন্য ললিতের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু ললিত ইহা তাহার নিজের দরকারের জন্য মেরামত করাইতেছে বলিয়া তাহাদের সকলকে ভাগাইয়া দিয়াছে। লোকের কৌতূহল ও উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে এক ঘটনায় তাহাদের সকলেরই মনের সন্দেহ দূর হইয়া গেল। সহরের একজন মাতব্বর ললিতকে এ সম্বন্ধে একদিন প্রশ্ন করিল,—"গুজব শুনছি, আপনি এখানে মদের দোকান খুলবেন, তাকি সত্যি? আমার ত বিশ্বাস হয় না।"

ললিত উত্তর করিল,—"সত্যি কথা। সেই জন্যেই মদের দোকানের কাছেই খুলছি। দেখি, সহরের অনেক লোক, কলের কর্ম্মচারীরা সব মদ খায়, মদ খাওয়াটা আমি খুব নিন্দা করি বটে, কিন্তু এই ব্যবসা করে যদি দুপয়সা লাভ হয় ত মন্দ কি? দশ বার দিন পরেই খুব জাঁকজমক করে দোকান খুলে দেব। আমি দোকান খুল্লে, পুরানো দোকানের অনেক খদ্দের নিশ্চয়ই ছেড়ে আসবে।"

লোকটী উত্তর শুনিয়া যথার্থই হতভম্ব হইয়া গেল। ললিত যদি সাদাকে কালো বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা করিত, তাহা হইলেও সে অতটা বিস্মিত হইত না, যত বিস্মিত হইল তাহার মুখে এই অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া। সে ললিতকে বলিল,—"আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলাম বলে কিছু মনে করবেন না। পাড়ায় গুজব শুনে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি, বরং আমার

উল্টে রাগও হয়েছিল। মনে করেছিলাম আপনার নিকট আসল খবর পেয়ে আমি এ গুজবের প্রতিবাদ করবো।"

"বরং আপনি অনুগ্রহ করে সকলের কাছে এ ঠিক সংবাদটা প্রচার করলে আমি বড় বাধিত হবো, যাতে আমার দুচার জন খদ্দের বেশী হয়।"

লোকটী স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় চলিয়া গেল। সর্ব্বজন-পূজিত সংযতচিত্ত ললিত বাবুর ঘাড়ে কি ভূত চাপিল? তিনি নিজে মদের দোকান স্থাপিত করিতেছেন! সে যতই এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই হতবুদ্ধি হইতে লাগিল। এ প্রহেলিকার রহস্যোদ্ঘাটন তাহার ক্ষমতার অতীত বলিয়া সে অনুভব করিল এবং ললিতের কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাদের মন হইতে সন্দেহের রেখা মুছিয়া দিল।

কলের কর্ম্মচারীদের স্ত্রীরা এ সংবাদ শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। একজন বলিল,—"তাঁর নিজের মুখে শুনলেও এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমি ত গুজব শুনে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিলাম। আমাদের মনিব মদের দোকান খুলবে!" অপরে উত্তর করিল,—"একেই ত মিনষেগুলো মদ খেয়ে প্রায় সবই পয়সা উড়িয়ে দেয়। আবার বাবু যদি নিজে এদের উৎসাহ দেন, তাহলে মাইনের যাও ঘরে আসছিলো, তাও আর আসবে না। আমাদের না খেতে পেয়ে মরতে হবে।"

"ললিত বাবু কলে ঢুকবার পর থেকেই লোকদের মদ খাওয়া

বদ্ অভ্যাস ছাড়ানর জন্যে কত চেষ্টা করে আসছেন। তাঁর বাপও এর ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের সুপরামর্শে কত লোক উচ্ছন্ন যেতে যেতে বেঁচে গেছে। আমাদের দুরদৃষ্ট যে, সেই ললিতবাবুই আবার নিজে মদের দোকান খুলে বসলেন!"

"সেদিন শুনলাম, তাঁর মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, এক অতিথশালা খুলতে। গরীব দুঃখীরা সেখানে দুবেলা দুমুঠো অন্ন পাবে। তিনি ত অকালে মারা গেলেন, ছোট ছেলে অনেক টাকা নষ্ট করে ফেলায় শিবশঙ্কর বাবুও তাঁর জীবদ্দশায় সে কাজ করে যেতে পারলেন না। উনি এখন কোথায় অতিথশালা তৈরী করে বাপ মায়ের নাম বজায় রাখবেন, তা না করে একেবারে মদের দোকান খুলে বসলেন! কায়স্থের ছেলে, মিত্তরবংশ অত বড় বংশ, তাঁর শেষে এই ব্যবসা!"

"শুনলাম, রাম বলে যে কর্ম্মচারী ছিল, কলে পা কেটে যাবার পর থেকে সে ত আর কোনও কাজ করতে পারে না, তাকেই বাবু এই দোকানের কর্ত্তা করে দেবেন।"

"রাম? সে ত মদ খেত না। এমন কি মদের গন্ধও সইতে পারতো না। সে কর্ত্তা হবে? ওঃ! বুঝেছি, পাছে মদ খায় এমন কোনও লোককে দোকানে রাখলে দোকান ভাল করে না চলে, তাই তাকে রাখবার মতলব। বাবুর আমাদের এদিকে বুদ্ধির দৌড় খুব।"

নূতন বাড়ী মেরামত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর

দু'এক দিন পরেই দোকান খুলিবার সব বন্দোবস্ত চলিতেছে। ললিত একদিন বাড়ীটা পরিদর্শন করিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময় হরির সহিত তাহার পথে দেখা হইল। ললিত হাসিমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হরিদা, এদিকে ত সব ঠিকঠাক হয়ে এলো বলে। আমরা দু এক দিনের মধ্যেই দোকান খুলবো। লোকেরা সব কি বলে?"

হরি একমুখ হাসিয়া উত্তর করিল,—"মেয়েগুলো সব ত একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠেছে। তারা বলে তুমি দোকান খুলে পুরুষদের মদ খেতে উৎসাহ দিলে, আর তারা পেটে খেতে পাবে না। ছেলে পিলেরা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তাদের কাছে তোমার খাতিরটুকু নষ্ট হয়ে গেছে!"

ললিত হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল!

বাড়ী আসিয়া সে ইন্দিরার সন্ধান করিল। শয়নগৃহে তাহার দেখা পাইয়া ললিত তাহাকে আদর করিয়া নিকটে ডাকিল। ইন্দিরা তাহার উন্মুক্ত হৃদয় লইয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি বাড়ীর সম্মুখস্থ উদ্যানের উচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষদেশকে স্বর্ণসিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। ইন্দিরা একখানি নীল বর্ণের সিল্কের শাড়ী পড়িয়াছিল। সে পোষাকে তাহার সুশ্রী তন্বী আকৃতির শোভা আরও শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা দুইজনে উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট আসিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। বিভিন্ন বর্ণের সোণালী

আভামণ্ডিত মেঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ললিত ইন্দিরাকে লিল,—"বড় সুন্দর দৃশ্য!"

"আমিও একলা বসে বসে তাই ভাবছিলাম, আর তোমার জন্যে—" বলিতে বলিতে ইন্দিরা হঠাৎ থামিয়া গেল। লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিল।

ললিত তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার অর্দ্ধ-সমাপ্ত কথা শেষ করিয়া দিল,—"আর আমার জন্যে ভাবছিলে, কেমন ঠিক ত? দেখ, তোমার সঙ্গে আমার আজ একটা দরকারী কথা আছে। কলের লোকেদের অবস্থার কথা তোমার কাছে সবই ত খুলে বলেছি। এখন এ বিষয়ে তোমারও কিছু সাহায্য আমার চাই।"

ইন্দিরা তাহার উজ্জ্বল আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয় স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। ললিতের নিকট কলের লোকেদের দুরবস্থা ও দুঃখ-কষ্টের কাহিনী শুনিয়া তাহাদের জন্য ইন্দিরার কোমল নারীপ্রাণ যথার্থই বড় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ললিত ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল,—"দেখ, পুরুষদের উন্নত করবার চেষ্টা আমি সাধ্যমত করবো, কিন্তু তাদের স্ত্রীদেরও সুশিক্ষা দিতে না পারলে কোনও ফল হবে না। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অপরিষ্কার ঝগড়াটে, সংসারটাকে একেবারে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে রাখে। আমার দ্বারা ত এ দিকে কিছু হবে না। তোমাকেই মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের সাংসারিক

জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। তাদের দুঃখ কষ্টে সহানুভূতি দেখিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে, কষ্টের ভার কিসে লাঘব হয়, সে সম্বন্ধে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।”

ইন্দিরার বড় বড় চোখ দু'টা ছল-ছল করিয়া উঠিল। দুঃখের নয়, আনন্দাশ্রু তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীর এ মহৎ অনুষ্ঠানে সে যে কেবল মুখে উৎসাহ না দিয়া কার্য্যক্ষেত্রেও তাহার সহায়তা করিতে পারিবে, এ আনন্দ ও গর্ব্বে তাহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। সে আর মুখে কিছু বলিতে পারিল না, ললিতের বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ললিত তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল,—“আমি জানতাম তুমি নিশ্চয়ই আমার কথায় রাজি হবে। হরিদা বলে, আমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, এ দিকে তাঁর নজর ছিল, কিন্তু নতুন মা এ সব আদৌ গ্রাহ্য করতেন না। তিনি বোধ হয় জীবনে এক দিনও তাদের বাড়ী মাড়ান নি। অনেক কাজ করবার আছে, তোমাকে একটু একটু করে অগ্রসর হতে হবে।”

“আচ্ছা, এর ফল কিছু হবে কি?”

“হয় ত যতটা আশা করে করছি, ততটা নাও হতে পারে। লোকের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত, লেখাপড়া জানে না। তবু আন্তরিক চেষ্টা করলে আমার স্থির বিশ্বাস, অনেকটা কাজ হবে। তা না হলেও আমাদের দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই,

নিজেদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করে যাই, ফল ভগবানের হাতে। কেবল নিজেদের সংসার ও ছেলে পিলে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকবার জন্যেই কি ভগবান আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? আমি যে ওদের দেহ ও মনের উন্নতিকল্পে কেবল প্রাণপণ পরিশ্রম করেই ক্ষান্ত হবো, তা নয়, আমাদের ব্যবসার লাভের অর্দ্ধেকও আমি ওদের হিতসাধনে ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি।”

“সে ত ঠিকই কথা! ওরাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, আমাদের লাভ হচ্ছে। সেই লাভের উপর কেবল নির্দ্দিষ্ট বেতন ছাড়া কি ওদের একটা দাবি নেই? অধীন লোকদের সুখদুঃখের কথা মনিবরা যদি না চিন্তা করে, তাহলে তারা দাঁড়াবে কোথায়? তাদের কেবল মাইনে দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে মানুষের কাছে চলতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিকট তার জবাবদিহি দেওয়া যায় না।”

ইন্দিরার রক্তাভ মুখখানি নিজের মুখের কাছে আনিয়া ললিত আবেগভরে বলিল,—“ইন্দু, ঠিক বলেছ। নিজেদের প্রতি, অধীন লোক জনের প্রতি, ভগবানের প্রতি, যিনি ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি করে দরিদ্রের উপর ধনীর প্রভুত্ব চালাবার জন্যে সংসারে আমাদের পাঠিয়েছেন, সকলের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। পৃথিবীতে আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী মাত্র! জীবনের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে, দৈনিক ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র দুঃখ চিন্তার মধ্যে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রীতি সম্মিলনের মধ্যে, পুত্র পরিজনের মিলনসুখ ভোগের মধ্যে এটা আমাদের সর্ব্বদাই যেন মনে থাকে যে, এ পৃথিবীতে আমরা দুদিনের পথিক মাত্র, সন্ধ্যা হলেই পাথেয় জেগাড় করে যে দেশে আলো কখন নেভে না, সেই দেশের উদ্দেশে যাত্রা করবার জন্যে বৈতরণীর খেয়াঘাটে এসে হাজির হতে হবে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন বাড়ীর বন্দোবস্ত সব যথাসময়ে সম্পূর্ণ হইল। যে রাত্রে দোকান খোলা হইবে, সেদিন অপরাহ্নে কাজকর্ম্মের পর ললিত তাহার কলের কর্ম্মচারীদের সব একত্র ডাকিয়া বলিল,—"আমি বেশীক্ষণ তোমাদের অপেক্ষা করাবো না। কেবল দুটো কথা তোমাদের বলতে চাই। নতুন দোকান আজ খোলা হচ্ছে, তোমারা সকলেই বোধ হয় রাত্রে আজ সেখানে যাচ্ছো। কি বল?"

সকলেই ঘাড় নাড়িয়া মনিবের কথায় সম্মতি জানাইল। ললিত বলিতে লাগিল,—"তোমরা সকলেই সেখানে গেলে, আমি বড়ই খুসী হবো। কিন্তু সেখানে যাবার আগে তোমাদের গোটাকতক সর্ত্ত পালন করতে হবে। সেই কথাই তোমাদের বলতে চাই।"

"আমরা সবাই আপনার কথামত চলবো।"

"প্রথম, আজ রাত্রে যারা যাবে, তাদের একমাস ঠিক নিয়মিত ভাবে সেখানে যেতে হবে। একদিনও ভুল্‌লে চলবে না।"

এ সর্ত্ত মানিয়া চলিতে তাহারা সকলেই স্বীকৃত হইল।

"ব্যস্ত হয়ো না, আগে সব কথা শোন; তারপর প্রতিজ্ঞা

করবে। এই একমাস তোমরা অপর দোকানে কিছুতেই ঢুকতে পারবে না, আমার দোকানেই আসবে।"

কেন তাহারা মনিবের দোকান ছাড়িয়া অন্য দোকানে যাইবে?

"তৃতীয় কথা হচ্ছে, এই একমাস তোমরা যা পান করবে. তার জন্যে কিছু খরচ দিতে হবে না। সব আমার খরচ!"

মহানন্দে সকলেই হৈ চৈ করিতে লাগিল। নিজের প্রশংসাবাদ শুনিতে শুনিতে ললিতের কানে তালা লাগিবার জোগাড় হইল। গোলমাল থামিলে ললিত আবার বলিতে লাগিল,—"শেষ কথা হচ্ছে, এই একমাসে তোমাদের মতি স্থির করতে চেষ্টা করবে যে, ভবিষ্যতেও তোমরা আমার দোকানেরই খদ্দের থাকবে, অপর দোকানে কিছুতেই যাবে না।"

সকলেই উচ্চৈঃস্বরে শপথ করিল, মনিবের দোকান খোলা থাকিতে তাহারা আর অন্য কোন দোকানেই পদার্পণ করিবে না।

ললিত চেঁচাইয়া বলিল,—"আচ্ছা একটু চুপ কর। আমার দোকানের গোটাকতক নিয়ম তোমাদের বলি, শুন। প্রথম, আমি যতটা ইচ্ছে করবো, তার বেশী কেউ খেতে পারবে না।"

এবার সকলেই নীরব, পূর্ব্বের সে উৎসাহ আর নাই!

"দ্বিতীয়তঃ আমি যা পান করতে দেব, তাতে কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারবে না। তোমরা যে জিনিষ খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ

তা হতে এ জিনিষ সম্পূর্ণ বিভিন্নও হতে পারে। কিন্তু আমার দোকানে যেতে যদি প্রতিজ্ঞা কর, তা হলে সে জিনিষ খেতেই হবে, খুঁত খুঁত করতে পারবে না।"

এ প্রতিজ্ঞা তাহারা অনায়াসে করিতে পারে।

"শোন, তোমরা হয়ত এতদিন ভাল মদ খেয়ে আসছো, আমার দোকানের জিনিষ খারাপও হতে পারে, জান ত আমি নিজে এ জিনিষ ছুঁই না, ওর সমজদারও নই। তাহলেও তোমরা একমাস তোমাদের এ প্রতিজ্ঞা রাখবে তো?"

সে ক্ষেত্রেও তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। তিনি যেখান হইতে মদ কিনিবেন, তাহারা যদি তাঁহাকে প্রতারিত করে, তাহাতে তাঁহার দোষ কি?

"কিন্তু ধর হয় ত একদম মদই পাবে না। যে জিনিষ খেতে দেওয়া হবে, তেমন জিনিষ তোমরা হয় ত পূর্ব্বে কখনও খাও নি, খেতে ভালও না লাগতে পারে। তাহলেও তোমাদের প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। সব ঠিক করে ভেবে দেখে প্রতিজ্ঞা কর। একদিন যদি খাও, একমাস ঠিক নিয়মমত খেতে হবে, কোনও আপত্তি করতে পারবে না। যারা এ সব সর্ত্ত ও নিয়ম মেনে চলতে পারবে না, তারা প্রতিজ্ঞা করো না। কিন্তু তোমাদের সকলকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। তোমরা কেউ কি আমার বাবাকে বা আমাকে কখনও তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করতে দেখেছ?"

একজনও নহে। একথা শুনিয়া অনেকেরই চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল। এমন সহৃদয় প্রভুর অধীনে কাজ করা হতভাগ্য শ্রমজীবীদের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। এত সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু!

ললিত ভাব-বিগলিত স্বরে বলিতে লাগিল,—"আমাদের যদি এত ভাল বলেই তোমাদের বিশ্বাস, তাহলে তার প্রতিদানে তোমরাও নিশ্চয়ই একটু স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ। আমার দোকানের জিনিষে যদি তোমাদের রসনার তৃপ্তি না হয়, তা সহ্য করেও তোমাদের পূজনীয় মৃত মনিবের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ একমাস পরীক্ষা করে দেখ।"

এ কথায় উপস্থিত সকলেরই মন বিচলিত হইল। যাহারা মনিবের শেষ কথা শুনিয়া একেবারে দমিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষিত হইল। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল, মদ খাইতে পাউক আর নাই পাউক, তাহারা একমাস নিশ্চয়ই তাঁহার দোকানে নিয়মিত ভাবে যাইবে। রাত্রে আবার তাহাদের সহিত দোকানে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া ললিত তাহাদের বিদায় দিল।

নূতন বাড়ীর ভিতর দেশ দেখিবার জন্য সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে যথাসময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতর চারখানি বড় বড় ঘর। সব ঘরই সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। প্রত্যেক ঘরের ভিতরেই চেয়ার টেবিল ও

বেঞ্চি যথাযথ স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। দেওয়ালে সব ঠাকুর-দেবতা, দশ অবতার ও মহাপুরুষদের চিত্র ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যাহারা পড়িতে জানে, তাহাদের জন্য টেবিলের উপর নানাপ্রকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছড়ান রহিয়াছে; যাহারা লেখা-পড়া জানে না, তাহাদের জন্য সুন্দর সুন্দর উপদেশমূলক চিত্তাকর্ষক চিত্রপরিপূর্ণ পুস্তক রহিয়াছে। অল্প বিদ্যায় পড়িতে ও বুঝিতে পারে, সহজ ভাষায় লিখিত এমন শিক্ষাপ্রদ পুস্তক সকল আলমারির ভিতর রক্ষিত হইয়াছে। এক ঘরে তাস, পাসা, দাবা, ক্যারম প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলার সরঞ্জাম সজ্জিত রহিয়াছে। এখানে মদের বোতলের অভাব হইলেও, এমন আরামপূর্ণ সুখের স্থানে তাহারা জীবনে কেহ কখনও পদার্পণ করে নাই।

লোকেরা কি ধূমপান করিতে পারে? ললিত ভাবিল, ধূম-পান ইহাদের দৈনিক খাদ্যের অঙ্গবিশেষ, প্রথম হইতে এ বিষয়ে তাহাদের বাধা দিলে মতলব ফাঁসিয়া যাইতে পারে; সে উহাদের ধূমপান করিতে আদেশ দিল। ললিত চুরুট বা তামাকের কোনও বন্দোবস্ত করে নাই। লোকেরা সঙ্গে করিয়া চুরুট ও বিঁড়ি আনিয়াছিল। প্রথম কৌতূহলের বেগ শান্ত হইলে তাহারা সবাই স্থির হইয়া বসিল। এমন সময় চাকরে প্রত্যেককে এক এক পেয়ালা গরম উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা দিয়া গেল। এরূপ সুগন্ধি সুস্বাদু চা তাহারা জীবনে কখনও পান করে নাই। চায়ের

সঙ্গে রুটি ও মাখম। ললিত নিজে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া সকলকে আদর-আপ্যায়ন করিতে লাগিল। পত্রিকা ও পুস্তক হইতে লোকেদের পড়াইয়া শুনাইবার জন্য ললিত পূর্ব্ব হইতেই বেতন-ভুক্ত লোকের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তাহারা উপস্থিত লোকে-দের সহজ সহজ বিষয়গুলি পুস্তক ও পত্রিকা হইতে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

ইহাই তাহাদের মনিবের মদের দোকান! এ ত এক সুখপ্রদ আশ্রম, এখানে সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া একসঙ্গে বিশ্রাম ও আরাম, আনন্দ ও তৃপ্তি ভোগ করিবার সকল বন্দো-বস্তই রহিয়াছে। আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে শিক্ষালাভ! আবার সবই মনিবের খরচে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল,—"আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়ে গেছলো যে আমাদের মনিব মদের দোকান খুলবে বলে আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছিলো?" কিন্তু এখানে মদ নাই। যাহা হউক যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে একমাস তাহাদের এখানে আসিতেই হইবে। এমন সময় ললিত আসিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, চা তাহাদের কেমন লাগিয়াছে। না, যথার্থই এমন চা তাহারা পূর্ব্বে কখনও পান করে নাই! সে প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া সকলের সহিত প্রফুল্লভাবে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

একপাশে বৃদ্ধ হরির দেখা পাইয়া ললিত তাহাকে বলিল,—"হরি দা দেখে ত আশা হচ্ছে, কিছু ফল হতেও পারে।"

বিজয়গর্ব্বে বৃদ্ধের বুক আজ দশ হাত ফুলিয়া উঠিয়াছে ; সে উৎফুল্ল হইয়া উত্তর করিল,—"ভাই, ভগবান তোমার সহায় হবেন। মা আমার মৃত্যুর আগে যে ভগবানের হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে গেছেন। তিনিই তোমার এ সাধু উদ্দেশ্য সফল করবেন।"

অন্নপূর্ণার কথা স্মরণ করিয়া ললিত ও হরি দুইজনেই বিচলিত হইল।

"হরি দা, একমাস পরে যদি দুচার জনকেও দলে আনতে পারি, তাহলেও আশায় বুক বেঁধে আমরা কাজ করে যাবো।"

"সময়ে সব ঠিক হবে। সকলে ভাল না হলেও বেশীর ভাগই যে মদ খাওয়া ছাড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

পরদিন বিকালে ললিত কল হইতে বাড়ী ফিরিতেছে, এমন সময় পথে দু'একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কলেরই কর্ম্মচারীদের আত্মীয়া। ললিতকে তাহারা শৈশব হইতেই দেখিয়া আসিতেছে, তাহার সহিত কথা কহিতে তাহারা লজ্জা বোধ করে না। গত রাত্রেই তাহারা ললিতের নূতন দোকানের সংবাদ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। উহা যে মদের দোকান নহে, তাহাদেরই স্বামী-পুত্রদের সৎপথে আনিবার জন্য ললিত নিজব্যয়ে উহা স্থাপিত করিয়াছে, ইহা শুনিয়া তাহাদের অন্তঃকরণ আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

একজন ললিতকে বলিল,—"বাবা, কি বলে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো, তা জানি না। তুমি মদের দোকান খুলছো শুনে, আমরা তোমার স্বভাব চরিত্র এতদিন জেনেও সে কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। তুমি আমাদের যা উপকার করছো, ভগবান তোমাকে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করবে।"

ললিত হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কিন্তু তোমাদেরও সাবধান হতে হবে। শুনি, বাড়ীতে তোমরা এত অশান্তির সৃষ্টি কর যে, ওরা একমুহূর্ত্তও বাড়ীতে থাকতে চায় না। কেবল তিরস্কার ও গালাগালি দিলেই কোন ফল হয় না। মিষ্টি কথায় ওদের বুঝাতে হবে। তাই বলছি তোমাদেরও দোষ আছে। আমি যা বলবো তোমাদেরও শুনতে হবে।"

"বাবা তুমি যা বলবে, আমরা ঠিক সেই মতই কাজ করবো। আজ দুপুরে বৌমাও নিজে এসে আমাদের এই কথা বুঝিয়ে গেছে। বাবা, কি আর বলবো, ভগবান তোমাদের সুখী করুন!"

ইন্দিরাও স্বামীর উপদেশ মত আজ হইতেই তাহার কাজে বিশেষ উৎসাহের সহিত লাগিয়া গিয়াছে।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

একমাস এই ভাবেই কাটিল। যাহারা প্রথম দিন আসিয়াছিল, তাহারা প্রত্যহই নিয়মিত ভাবে আসিয়াছে। মদ ছাড়িয়া এখানে যেন তাহারা মনের মধ্যে কি এক স্বর্গীয় শান্তি অনুভব করিয়াছে। তাহাদের দেহ বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছে, অর্থের অভাবে আর তাহাদের অনাহারে থাকিতে হয় না। ইন্দিরার শিক্ষা গুণে বাড়ীতেও তাহারা বেশ আনন্দে দিন কাটাইতেছে। এক কথায় তাহারা যেন এক সুখময় নবজীবনের স্বাদ পাইয়াছে, এত সুখ এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিল, মনিবের কি যাদুমন্ত্র বলে তাহা হঠাৎ আজ তাহাদের ভোগের বিষয়ীভূত হইল, তাহারা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

একমাস পরে ললিত তাহাদের সহিত আবার এক মাসের চুক্তি করিল। এবার কলের নূতন দু'চার জন ও পাড়ারও লোকেরা এ সমিতির সভ্য হইল। মদের দোকানের খরিদ্দার দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। ললিত উৎসাহিত হইয়া আরও মন দিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিল। মাসের পর মাস যতই যায়, তাহার দোকানে লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ললিত অর্থব্যয়ের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিল।

সুধীর এ সংবাদ শুনিয়া সুরমাকে লইয়া ললিতের সহিত দেখা করিতে আসিল। ললিত তাহাকে সে রাত্রে সঙ্গে লইয়া গিয়া সব দেখাইয়া আসিল। সুধীর ব্যাপার দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে সংবাদ লইয়া জানিল যে কলের প্রায় তৃতীয়-চতুর্থাংশ কর্ম্মচারী ও পাড়ারও জনকতক লোক নিয়মিত ভাবে এখানে আসিতেছে। কিন্তু একটা বিষয় সে ললিতকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই মাসে খরচ ত অনেক হবে?"

ললিত হাসিয়া উত্তর করিল,—"তা হবে বই কি! কিন্তু আমি তাতে আদৌ কুণ্ঠিত নই। ভাই এ খরচ বহন করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়? ওরা যে প্রাণপণ পরিশ্রম করে দেহপাত করছে, সেকি কেবল আমাদেরই সুখ ও অর্থ বৃদ্ধির জন্যে? ওদের অর্জ্জিত অর্থের উপর কি যৎসামান্য নির্দ্দিষ্ট বেতন ছাড়া আর অন্য কোনও দাবি নেই? এই এক মদের জন্যই আমার মা, বাবা সব অকালে ইহসংসার ত্যাগ করেছেন? কলের লোক গুলোর অবস্থা দেখে আমার মনে বড়ই দুঃখ হয়। তাই যদি কিছু কাজ হয়, এই ভেবে আমি এই মতলব আঁটি। এখন ভগবানের অনুগ্রহে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। যদি এক জনেরও চরিত্র সংশোধন করতে পারতাম তাহলেও আমার এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় নিরর্থক হলো বলে মনে করতাম না। একটা সংসারকেও ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে পারলে, আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম।"

"ভাই, একথা প্রথম শুনে আমার হাসি পেয়েছিলো, ভেবেছিলাম এও কি কখন সম্ভব? কিন্তু নিজের চোখে সব দেখে সে সন্দেহ আমার মন থেকে একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমি কলকাতায় গিয়ে বড় বড় লোকেদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবো, যাতে তাঁরাও তোমার আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন। তাহলে পৃথিবীর অনেক দুঃখ কষ্টের ভার লাঘব হয়ে যাবে।"

রাত্রে ললিত ইন্দিরাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া জানাইল যে, তাহার পরিশ্রম কার্য্যকরী হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও তাহার শিক্ষার গুণে অনেকটা উন্নত হইয়াছে। ইন্দিরা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"আহা বড় গরীব সব, তাদের অবস্থা দেখলে চোখে জল রাখতে পারি নি। মুখ ফিরিয়ে নিই।"

"ইন্দু, ওদের সামনে চোখের জল ফেলতে লজ্জা কি? এই চোখের জল দিয়েই একদিন তুমি ওদের হৃদয় জয় করতে পারবে।"

ললিতের মতলব বিশেষ ভাবে সফল হইল। পাড়ার সচ্চরিত্র যুবকবৃন্দও এখন তাহার এই সদনুষ্ঠানে সাধ্যমত সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ললিত তখন সেই বাড়ীরই উপরে নীচে ঘর বাড়াইয়া তাহার সহিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও অতিথি-শালা সংলগ্ন করিয়া দিয়া এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের নামকরণ করিল,—**অন্নপূর্ণার আশ্রম**।

জীবনের পথে

ললিত একদিন আশ্রমে খুব জাঁক-জমকের সহিত প্রচুর ভোজের আয়োজন করিল। আহারাদির পর সে সকলকে একত্র করিয়া বলিল—"তোমরা যে তোমাদের প্রতিজ্ঞা ঠিক রক্ষা করেছ, তাতে আমি বড়ই আনন্দিত। আমার এই আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য এখন বোধ হয় তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ?"

নিশ্চয়ই, তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য!

"ঠিক, তাই, তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীপুত্রের মঙ্গলের জন্য, এ পৃথিবীতে ও পরলোকেও তোমাদের মঙ্গলের জন্যে! তোমাদের কিসে হিতসাধন হবে সেই চিন্তাতে আমি অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। তোমাদেরও যেমন আমার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, আমারও তেমনি তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট। সে কর্ত্তব্যের অবহেলা করলে পরলোকে গিয়ে আমাদের দুজনকেই জবাবদিহি দিতে হবে। আমি তোমাদের সৎপথে চলবার পথ নির্দ্দেশ করে দেব। যত দিন তোমরা বদ্ অভ্যাস সব ত্যাগ করতে না পেরেছিলে, তত দিন তোমাদের কোনও আশা ভরসাই ছিল না, সত্যি নয় কি?"

সত্য কথা! তাহারা কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া মাথা হেঁট কবিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কিন্তু এখন তোমরা অনেকটা পথ অগ্রসর হয়েছ, এ অগ্রসর অল্প হলেও বড় শুভ। কোন কাজই একেবারে সম্পন্ন হয় না; এই একটু একটু করে অগ্রসর হয়েই আশা করি,

তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌছুতে পারবে। আমি আজীবন সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে পাহারা দেব, যাতে তোমরা আর অন্ধকারেও পথভ্রষ্ট না হও!"

সকলেই উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ হরি ললিতের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। অতিরিক্ত আনন্দের বেগে তাহার চক্ষু হইতে টস্‌টস্ করিয়া বড় বড় ফোঁটা জল পড়িতেছিল। ললিতের গুণকীর্ত্তনে ও প্রশংসাবাদ শ্রবণে তাহার ন্যায় সুখী আজ কে? অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পর সেই যে কোলে পিঠে করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছে!

গোলমাল থামিলে ললিত পুনর্ব্বার বলিল,—"তোমরাই একদিন বলেছ আমি কখনও তোমাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করি নি। স্থির জেনো, ভবিষ্যতেও কখন তোমাদের সে ধারণা ভ্রান্ত হবে না। তোমরা যদি আমার উপদেশ মত ভাল হতে চেষ্টা কর, দেখবে পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও ঢের বেশী সদয় ব্যবহার আমার কাছে তোমরা পাবে। নিজেদের উন্নতির জন্যে তোমারা কি ভাল হতে চেষ্টা করবে না?"

তাহারা নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে! যদিও অনেকেরই আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, কৃতজ্ঞতায় তাহাদের অন্তঃকরণ ও চক্ষু পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

"তোমরা সকলেই আমার ছোট ভায়ের মত। প্রায়ই আমি তোমাদের ভাবনা ভাবি। এর জন্যে কতলোকের কাছে

আমাকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। আমি তা গ্রাহ্যও করি নি। তোমরা আমার কথা মত না চল্‌লে আমাদের উভয়েরই কষ্টের সীমা থাকবে না। একটুখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারলে প্রচুর পুরস্কারের তোমরা অধিকারী হবে। তোমাদের উৎসাহিত করবার জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো। আমি কথা বলছি, তোমরা শুনছো, আমাদের করুণাময় পরমেশ্বর ঊর্দ্ধ হতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। আমরা সকলেই কবে অসৎপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করবো, সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য তিনি উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন ; আমরা কষ্টভোগ করলে তাঁর প্রাণে বড়ই বাজে, তাই তিনি যারা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয় তাদের সাহায্য করবার জন্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এ নশ্বর জীবনে আমরা যেন এমন কাজ করে যেতে পারি, যাতে জীবনান্তে তিনি তাঁর রাজ্যে আমাদের এই বলে সাদর অভ্যর্থনা করতে পারেন,—'বাছা, তোমার কর্ত্তব্য তুমি যথাযথ সম্পন্ন করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, এবার আমার বক্ষে মাথা রেখে বিশ্রাম সুখ ভোগ কর।' "

বলিতে বলিতে ললিত প্রাণের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল। শ্রোতৃবর্গ পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিভরে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। এ অশ্রুপাত কিসের জন্য কে বলিতে পারে ?

সমাপ্ত

পৈতৃক সম্পত্তি

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

মূল্যবান এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, সিল্কে বাঁধাই, ২০০ পৃষ্ঠা।

"গ্রন্থে যে কয়টি চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, প্রায় সবগুলিই বেশ স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অমিয়কুমার, নরেন্দ্র, যূথিকা, বেলা ও লুলিয়া উপন্যাসখানির প্রধান চরিত্র কয়টিই বেশ সুচিত্রিত। * * * পুস্তকখানির ভাষা আড়ম্বরশূন্য, সরল, প্রাঞ্জল এবং সুসংযত। পাঠকবর্গের নিকট উপন্যাসখানি সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।"—মানসী ও মর্ম্মবাণী।

"It is a romantic tale and the characters figuring in it are in a tune with the nature of the story. In these days of wilful stylistic eccentricities and experiments it is a relief to turn to the chaste, simple and elegant Bengali to which Babu Anil Chandra scrupulously adheres."—*The Bengalee.*

"প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত। ঘটনা-বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং গ্রন্থের শেষ অবধি টানিয়া লইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, অনেকগুলি চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে। যূথিকা ও অমিয়-কুমারের বিমল প্রেম ও অকপট স্বার্থত্যাগ, বেলার বালিকাসুলভ চাপল্য, রহস্যপ্রিয়তা ও মানবচরিত্রে অন্তর্দ্দৃষ্টি, নরেন্দ্রের লোভ, পর-শ্রীকাতরতা, হিংসা ও পাপের পরিণাম প্রভৃতি অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।"—অর্চ্চনা।

শুকতারা

(ছোট গল্পের বই)

দুই রংয়ের কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই, ১৫০ পৃষ্ঠা।

অন্নদা বুক্‌ষ্টলের ॥০ সংস্করণের নবম গ্রন্থ।

"অন্নদা বুকষ্টল এই গ্রন্থখানিকে আট আনা সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছে। কয়েকটি ভাল গল্পের সমষ্টিতে পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। উপন্যাস-পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।"—অর্চ্চনা।

"গল্পগুলি নানা ধরণের—রচনায় ক্ষমতার পরিচয় সপ্রকাশ।"— দৈনিক বসুমতী।

"All the stories are well-written and the style is throughout chaste and simple. The author has shown unmistakable proof of his power of story-telling."—*The Bengalee.*

"গল্পগুলি পাঠের আগ্রহোত্তেজক। ভাষা গল্প-রচনারই উপযোগী। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ।"—বঙ্গবাসী।

"নবীন লেখকের সাহিত্যসাধনা সার্থক হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।"—নায়ক।

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

র্গ সংখ্যা　　　　　　　　পরিগ্রহণ সংখ্যা..............................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে ন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে রিমানা দিতে হইবে।

ারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
[illegible]			

জীবনের পথে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের উজ্জ্বল অপরাহ্ণ। মিত্র-পরিবারের প্রশস্ত অট্টালিকার এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া বাড়ীর এক দাসী নীরোদা ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইয়াই সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"শ্যামা দিদি, ওঠ না, খুকী কাঁদছে যে!"

শ্যামা মিত্র-পরিবারের বহুকালের পুরাতন বিশ্বাসী দাসী। বাড়ীর সকলেই তাহাকে এত আদর যত্ন করে যেন সে এ পরিবারেরই একজন। নীরোদারই নিকট মেজের উপর শুইয়া সে একটু তন্দ্রা গিয়াছিল। অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে বিরক্তিভবে নীরোদার দিকে তাকাইয়া বলিল,—"আমায় কি বল্‌ছিলি?"

"হাঁ গো, খুকী কাঁদছে যে, শুনতে পাচ্ছো না?"

শ্যামা উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে দশমাসের এক সুদর্শন

শিশু কন্যাকে কোলে করিয়া লইয়া আসিল। শিশুর মুখখান ঠিক ফুটন্ত গোলাপের মতই সুন্দর, তাহার রক্তবর্ণ কোমল গণ্ডস্থল হইতে যেন ডালিম ফাটিয়া পড়িতেছে; তাহার চক্ষুর্দ্বয় টানা, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। শ্যামা শিশুটিকে কোলে ফেলিয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু শিশুরা সাধারণতঃ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই যেরূপ কোপনস্বভাব হয়, সেও সেরূপ অবাধ্য হইয়া উঠিল। শ্যামা গান গাহিয়া মাথা চাপড়াইয়া পা দোলা দিতে লাগিল।

নীরোদা বলিয়া উঠিল, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে, আর ঘুমুবে না। দেখতে পাচ্ছ না ওর ক্ষিধে পেয়েছে।"

শ্যামা কোনও উত্তর করিল না। সে ইতিমধ্যে তন্দ্রার ঝোঁকে চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছিল। শিশু শান্ত হইয়া স্থিরভাবে তাহার কোলের উপর শুইয়াছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার হঠাৎ ঘন ঘন কাশিতে লাগিল। শ্যামা তাহাকে বসাইয়া পিঠ চাপড়াইতে আরম্ভ করিল কিন্তু কাশির বেগ কিছুতেই থামিল না। গত সপ্তাহ ধরিয়া শিশু সর্দ্দিকাশিতে বড় ভুগিতেছিল, আজ একটু ভাল আছে। শ্যামা উঠিয়া তাকের উপর খুকীর ঔষধের শিশিটা খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না।

সে নীরোদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুকীর ওষুধ কোথায় রেখেছিস্?"

"আমি কি জানি? আমি সে শিশি ছুঁইও নি।"

"নিশ্চয়ই কেউ এ সব ঘেঁটেছে, তা না হ'লে শিশি কি উড়ে গেল! আমি সকালে ওষুধ খাইয়ে শিশি এই তাকের উপর রেখেছি, আমার বেশ মনে আছে। দেখি, মায়ের ঘরটা একবার খুঁজে আসি।"

শ্যামা রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল। শিশু তখনও তাহার কোলে কাশিতেছে। কিছুক্ষণ পরে একটি শিশি হাতে করিয়া সে ঘরের ভিতর ঢুকিল এবং নীরোদার দিকে চাহিয়া বলিল,—"এই দেখ্, যা ভেবেছি, তাই। কে মায়ের ঘরে তাকের উপর শিশিটা রেখে এসেছে। এ নিশ্চয়ই সেই নতুন চাকরটার কাজ।"

এই বলিয়া সে শিশি হইতে এক চামচ ঔষধ ঢালিয়া খুকীকে খাওয়াইল; কিন্তু নীরোদার মনে বিষম খটকা লাগিল। নূতন চাকরই বা কেন হঠাৎ খুকীর ঔষধ স্থানান্তরিত করিতে যাইবে? তবে কি শ্যামা অন্য কোন ঔষধের শিশি লইয়া আসিল? গভীর সন্দেহ-দোলায় তাহার মন দুলিতে লাগিল। সে কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল খুকীরই দাদার পুস্তকের পাশে সেই ঔষধের শিশিটি লুক্কায়িত রহিয়াছে।

"শ্যামা দিদি, কি করলে?" সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"খুকীর ওষুধের শিশি এই যে দাদাবাবুর বয়ের পাশে পড়েছিল! তাকে কি ওষুধ খাওয়ালে?"

শ্যামা হতভম্ব হইয়া নীরোদার হস্তস্থিত শিশি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজের হস্তস্থিত শিশির প্রতি চাহিল। দু'টি শিশিই আয়তনে ও গঠনে দেখিতে প্রায় একরূপই এবং অর্দ্ধ-শূন্য। তাহাদের ভিতরস্থ তরলপদার্থও সমবর্ণের। নীরোদা শ্যামার হাত হইতে শিশিটি ছিনাইয়া লইয়া ছিপি খুলিয়া ঘ্রাণ লইল। তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

"শ্যামা দিদি, করেছ কি? এ যে ছেলেকে একেবারে মেরে ফেলেছ দেখ্‌ছি। এ ত আফিমের আরক!"

শ্যামা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কি পাগলের মত বক্‌ছিস্? আফিমের আরক হ'তে যাবে কেন?"

নীরোদা জানিত যে, গিন্নী মা তাঁহার নিজের অসুখের জন্য এই আরক ব্যবহার করিতেন। শিশি দেখিয়াই সে চিনিতে পারিয়াছিল। শ্যামার প্রতি ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিল,—"হতভাগী, আজ বোধ হয় আফিমের মাত্রা খুব চড়িয়েছে!"

এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করিলে চলিবে না। নীরোদা দ্রুতপদে সে ঘর ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং তাহার কাকা, বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য হরির দেখা পাইয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া আনিল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া তাহাকে উন্মত্ত বলিয়াই হরির মনে সন্দেহ হইল।

জীবনের পথে

"কাকা, যাও, দৌড়ে যাও, ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে এস, খুকী মর-মর।"

হরি বিস্মিতনেত্রে মুহূর্ত্তমাত্র তাহার দিকে তাকাইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। নীরোদা তখন তাহাকে আবার ডাকিয়া বলিল,—"হাঁ, আর ডাক্তার বাবুকে খুলে বলো যে, কাশির ওষুধের বদলে খুকীকে ভুলে আফিমের আরক খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। যাও, দৌড়ে যাও।" পরমুহূর্ত্তেই নীরোদা অপর একজন চাকরকে ডাকিয়া কলবাড়ীতে বাড়ীর কর্ত্তাকে সংবাদ দিতে পাঠাইল।

বাড়ী হইতে কিছুদূরেই মিত্র-পরিবারের বৃহৎ কলবাড়ী অবস্থিত। ভৃত্য তীর বেগে দৌড়িয়া গিয়া একেবারে মনিবের আফিস ঘরে উপস্থিত হইল। মনিব শিবশঙ্কর বাবুর বয়স আন্দাজ ত্রিশের কাছাকাছি। তিনি দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ, তাঁহার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত। তাঁহার মুখে মহত্ব ও উদারতার এমন একটা উজ্জ্বল আভা মণ্ডিত রহিয়াছে যে, দেখিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তিভরে দর্শকের মন স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকণা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। শিবশঙ্কর বাবু তখন সমাগত দুইজন ভদ্রলোকের সহিত ব্যবসায়-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন। বাড়ীর একজন ভৃত্যকে হঠাৎ এরূপ ব্যস্তসমস্তভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

চাকরটা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"আজ্ঞে, বাড়ীতে এক দুর্ঘটনা ঘটেছে। শ্যামা দাসী খুকীকে ভুলে ওষুধের বদলে আফিম খাইয়ে দিয়েছে।"

"আফিম খাইয়েছে!" শিবশঙ্কর বাবু গভীর বিস্ময়ের সহিত এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া উপস্থিত ভদ্রব্যক্তিদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। পথে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তার বাবুকে ডাকতে পাঠান হয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ, হরিদা ডাক্তার বাবুকে ডাকতে গেছে।"

বড়ই অশুভ মুহূর্ত্তে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। শিবশঙ্কর বাবুর স্ত্রী, শিশুর মা,—অন্নপূর্ণা তখন বাড়ী ছিলেন না। তিনি দুপুরে তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেই পিত্রালয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। শিশু কন্যার শরীর অসুস্থ বলিয়া তাহাকে বাড়ীতেই শ্যামার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাত্রেই তাঁহার ফিরিবার কথা।

সৌভাগ্যবশতঃ হরি বাড়ীতেই ডাক্তার বাবুর দেখা পাইয়াছিল। তিনিও যথাশীঘ্র মিত্রদের বাড়ী উপস্থিত হইয়া শিশুর প্রাণরক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাড়াবাড়ির প্রথম ঝোঁকটা একটু কমিয়া গেলে শিবশঙ্কর বাবু অল্প প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন স্ত্রীকে বাড়ী আনিবার জন্য গাড়ী জুতিতে চাকরকে আদেশ করিলেন। পরে হরিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হরি, যা, শীগ্গির যা, তোর মাঠাকুরুণকে সঙ্গে

করে নিয়ে আয়। আর দেখ, খুব সাবধান হয়ে এ সংবাদ তাকে দিবি। বলিস্, ডাক্তার বাবু বলেছেন, ভয়ের কোনও কারণ নেই।”

* * * * * *

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে। অন্নপূর্ণা পিত্রালয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এটর্ণী কালীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী মনোরমার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। চতুর্ব্বিংশবয়স্কা অন্নপূর্ণা দেখিতে অতীব সুশ্রী। তাঁহার সুগঠিত কুসুম-কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পদ্মকোরকবৎ, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় শরীরের সৌন্দর্য্য-সুষমা শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। কালীবাবু কলিকাতা হাই-কোর্টের এটর্ণী, বড়দিনের ছুটীতে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া দেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন। শিবশঙ্কর বাবুর পুত্র ললিতকুমার মামার নিকট বসিয়া কলিকাতার মনুমেণ্ট, যাদুঘর প্রভৃতির গল্প শুনিতেছিল। বালকের মুখে প্রখর বুদ্ধির এমন একটা ছাপ মারা রহিয়াছে যে, কালীবাবু কিছুতেই তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। সুন্দর, প্রশস্ত কপোল-দেশ,—বালক দেখিতে ঠিক তাহার পিতারই অনুরূপ। তাহার নেত্রদ্বয়ও ঠিক সেইরকম বৃহৎ ও উজ্জ্বল। তাহার বয়স তখন দশ বৎসর। সেই অন্নপূর্ণার প্রথম সন্তান। তাহার পর আর দুইটি পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, কিন্তু অকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষ এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

কালীবাবুর পুত্র কন্যারাও সেখানে বসিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মনোরমার চপলা নাম্নী ছোট ভগিনি ও বিধবা মাতাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা গতকল্য মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের অনুরোধে দু'দিন এ বাড়ীতে থাকিয়া যাইতেও সম্মত হইয়াছেন।

মনোরমা চা তৈয়ারী করিয়া নিজের ছেলেদের ও ললিতকে পান করিতে দিলেন। তাঁহার ছেলেমেয়েরা বেশ তৃপ্তির সহিত তাহা পান করিল কিন্তু অন্নপূর্ণা নিজ পুত্রকে উহা পান করিতে নিষেধ করিলেন। মাতার আদেশ অনুযায়ী ললিত উহা স্পর্শ করিল না। মনোরমা প্রথম হইতেই একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, প্রতি কাজেই অন্নপূর্ণা পুত্রকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন, পুত্র তাহাই মানিয়া চলিতেছে। এতটা বাড়াবাড়ি তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি অন্নপূর্ণাকে বলিলেন,—"আহা ছেলেমানুষ, ইচ্ছে মতন খাগ না। সব বিষয়ে অত শাসন ভাল নয়।" কিন্তু অন্নপূর্ণা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পুত্রকে যথেচ্ছা খাইতে অনুমতি দিতে পারিলেন না। কালীবাবু হাসিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু অপর একজন স্ত্রীলোক তাঁহার উপর টেক্কা দিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবে ইহা মনোরমার সহ্য হইল না। তিনি অন্নপূর্ণার উপর বিষম চটিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা বামাসুন্দরী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বিদ্রূপ সহকারে হাসিতে লাগিলেন।

তখন ছেলেমেয়েদের চরিত্র-গঠন প্রণালী লইয়া মনোরমা ও অন্নপূর্ণার মধ্যে গভীর আলোচনা আরম্ভ হইল। মনোরমা বলিলেন,—"ছেলেকে যতই শাসন কর না, যার যা স্বভাব কেউ ত্যাগ করাতে পারবে না।"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন,—"ওটা ভুল ধারণা, ছেলেবেলায় স্বভাব-চরিত্র যেরূপ ভাবে গঠিত হবে, বড় হলে তার কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; চারাটা যেদিকে বেঁকে, গাছটাও সেই দিকে হেলে, এ কথা সবাই জানে।"

"তুমি কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি কর। ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম মেনে চলতে গেলে, ওদের জীবনে আর সুখ কোথায়?"

"ঐখানেই তোমরা ভুল বোঝ, দিদি। এখন থেকে ছেলেদের কোন জিনিষেরই প্রতি একটা আসক্তি জন্মে দেওয়া ভাল নয়। যত বয়স বাড়বে, ঐ আসক্তি ক্রমেই বাড়তে থাকবে, তখন আর কিছুতেই কমাতে পারবে না। দেখেছি, অনেক বাড়ীতে বিজয়ার দিন ছোট ছেলেরাও সিদ্ধি খেলে, বাপ মারা কিছু বলেন না। কিন্তু ঐ অভ্যাস যে বয়সের সঙ্গে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তা তাঁরা ভাবেন না। ছেলেবেলায় সিদ্ধি খাওয়া অভ্যাস করে, বড় হয়ে অনেকে মদ খেতে শেখে, এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। ছেলেবেলায় কোন নেশা করাই ভাল নয়!"

"এতে ছেলেদের ওপর কিন্তু বড় অন্যায় করা হয়। ওদের কোন সাধই পূর্ণ হয় না। ঠাকুরজামায়েরও কি এ বিষয়ে ঐ একই মত?"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ দিদি। তিনি সমস্তদিনই প্রায় কাজে ব্যস্ত থাকেন, সংসারে মনোযোগ দেবার অবসর পান না। আমার ওপর সব ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। আমার মনে হয় এ বিষয়ে অবহেলা করা বাপ মার পক্ষে মহাপাপ!"

এমন সময় বাড়ীর চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, নীচে দিদিমণির শ্বশুরবাড়ী হইতে ভৃত্য হরি আসিয়াছে, দিদিমণিকে লইয়া যাইবার জন্য। সংবাদ শুনিয়া অন্নপূর্ণা একটু বিচলিত হইলেন। রাত্রে বাড়ী ফিরিবার কথা তিনি বলিয়াই আসিয়াছেন। এখনও সন্ধ্যা হয় নাই, অথচ লোক ডাকিতে আসে কেন? তবে কি স্বামীর বা খুকীর কোন বিপদ আপদ ঘটিল নাকি? তিনি তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া আসিয়া কাতরভাবে হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরি, যা ঘটেছে, সত্যি বল। কলবাড়ীতে কর্ত্তার কিছু বিপদ ঘটে নি ত?" সে ভয়ঙ্কর কথা মনে হইবামাত্র তিনি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

"না মাঠাকরুণ, আপনি অত ভয় পাবেন না। যা ভাবছেন, তা নয়; কর্ত্তা বেশ ভালই আছেন। তিনিই আমাকে আপনার নিকট পাঠালেন। খুকীর অসুখটা একটু বেড়েছে, তাই বাবু বল্লেন আপনাকে সংবাদ দিতে।"

অন্নপূর্ণা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খুকীর কাশিটা কি খুব বেড়েছে ?"

"না কাশি নয়, ডাক্তারবাবু বলেছেন, বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নেই। শ্যামা ভুলে ওষুধ মনে করে খুকীকে আপনার আফিমের আরক খাইয়ে দিয়েছে। তখনই ডাক্তার বাবু এসে ওষুধপত্র সব ঠিক করে দিয়েছেন। আপনার কোনও ভাবনা নেই। বাবু গাড়ী দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

"গাড়ী এনেছিস্, বেশ করেছিস্। একটু বস্, আমি শীগ্‌গির তাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

এ আকস্মিক বিপদপাতের কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিতে তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি বাড়ীর সকলের নিকট এ সংবাদ জানাইতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে বিদায় লইবার সময় মনোরমাকে বলিলেন,—"বৌদি, ললিত আজ এখানেই থাক। ওকে আর এখন আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না। পরে লোক পাঠালে, পাঠিয়ে দিও ; দেখি, মধুসূদন কি করেন !"

এই বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি পুত্রকে গাঢ় স্নেহভরে চুম্বন করিলেন। ললিতকুমারের বড় বড় চোখ দুটিও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে কাতরভাবে মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, আমাকে কেন নিয়ে গেলে না ? আমি কবে যাব ?"

অন্নপূর্ণা সোহাগভরে তাহার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন,—"মামার বাড়ী আজ থাক না! মামা মামী কত গল্প বলবেন, কত ছবির বই দেবেন। খুকী একটু ভাল থাকলে, কালই তোমাকে নিতে পাঠাব।" পরে যাইবার সময় চুপি চুপি ললিতকুমারকে বলিয়া গেলেন,—"দেখ, তোমার মামীমা যদি চা খেতে কখনও জিদ করেন ত খাবে না। খুব সাবধানে থাকবে।" এই বলিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ললিত মাতার কথায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, তাঁহার আদেশ তাহার শিরোধার্য্য, তাহা সে কখনও পালন করিতে বিস্মৃত হইবে না।

অন্নপূর্ণা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। ভৃত্য হরি গাড়ীর ছাদে বসিতে গেলে অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হরি, বড় ঠাণ্ডা, ভিতরে বস।" গাড়ী সশব্দে তীরবেগে ছুটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথে যাইতে যাইতে অন্নপূর্ণা সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং হরিকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হরি নীরোদার মুখে যতটা শুনিয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিল। অন্নপূর্ণা সে সব শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিলেন,—"আমি আসল কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আফিমের আরকের শিশি ত আমার ঘরে তাকের উপর ছিল। সেদিন দাঁতের গোড়ায় খুব যন্ত্রণা হওয়ায়, ডাক্তার বাবু লাগাবার জন্যে দিয়েছিলেন। শ্যামা খুকীর ওষুধ মনে করে আমার ঘর থেকে সে শিশি কেন আনলে, বুঝতে পারছি না। অপর কোনও ঝি চাকর হলে আমি ততটা বিস্মিত হতাম না,—কিন্তু শ্যামার এমন ভুল হলো,—এর কারণ কি! বোধ হয় ঘুমের ঘোরে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে।"

হরি উত্তর করিল,—"মা, নীরো বলছিলো, শ্যামা বোধ হয় আজ অতিরিক্ত আফিম খেয়েছে, তাই তার হুঁস ছিল না।"

অন্নপূর্ণা দুঃখিতভাবে বলিলেন,—"আমারও সে রকম সন্দেহ হয়! হুঁস থাকলে এ কাজ সে কখনও করতো না।"

সমস্ত পথই গাড়ী খুব জোর চলিয়া আসিয়া মিত্রদের কলবাড়ীর সম্মুখীন হইল। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে কলবাড়ীটি যেন দীর্ঘাকৃতি প্রেতবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কর্ম্মচারিগণ কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কলবাড়ীর রাস্তা পার হইয়া মিত্রদের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সহিস জোর করিয়া চেঁচাইতেই দরওয়ান দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। অন্নপূর্ণার আদেশ মত হরি তাহাকে গাড়ীর ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিল,—"পাঁড়েজি, খুকী এখন কেমন আছে বলতে পার?"

হরি এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না। ফটক খুলিতে গিয়া পাঁড়েজি হোঁচট খাইয়া সম্মুখের দিকে পড়িয়া গিয়াছিল। পরে উঠিয়া কোনও রকমে দরজা খুলিল বটে, কিন্তু পরে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে পুনর্ব্বার হোঁচট খাইয়া রাস্তায় লুটাপুটি খাইতে লাগিল। গাড়োয়ান ইতিমধ্যে ঘোড়াকে চাবুক কষাইয়া গাড়ী ফটকের ভিতরে চালাইয়া দিয়াছে। স্প্রাংয়ের দরজা পাঁড়েজির বন্ধনমুক্ত হইয়া একেবারে ঘোড়াদের গায়ে আসিয়া সজোরে পড়িল।

ঘোড়া দু'টা আঘাত খাইয়া লাফাইতে ও পা ছুঁড়িতে লাগিল। গাড়োয়ান প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বশে আনিতে পারিল না। তাহারা সম্মুখে বাধা পাইয়া বেগে আরোহীসমেত গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া লইয়া কলবাড়ীর দিকে

ছুটিল। অন্নপূর্ণা ভয়ে চেঁচাইয়া গাড়ীর ভিতর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হরি কাতরভাবে তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল,—"মা, আপনি দাঁড়াবেন না, তাহলেই প্রাণের ভয় আছে! আপনি গাড়ীর তলায় শুয়ে পড়ুন।"

অন্নপূর্ণা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আর চেষ্টা কেন! এ ত দেখছি নিশ্চয়ই মৃত্যু। কলবাড়ীতে ধাক্কা লাগালে বলে। মধুসূদন তোমার হাতেই আমার ছেলেমেয়ে সঁপে দিয়ে গেলাম, তুমি তাদের রক্ষা করো।"

অন্নপূর্ণা যদি হরির নিজের ঘরের স্ত্রীলোক হইতেন, তাহা হইলে সে জোর করিয়া তাঁহাকে গাড়ীর নীচে শোয়াইয়া দিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অতটা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। ভয়ে ও উত্তেজনায় অন্নপূর্ণা গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে ঘোড়া দু'টা কলবাড়ীর নিকট হাজির হইয়া বাড়ীর গায়ে সজোরে ধাক্কা মারিল। অন্নপূর্ণা মাটীতে পড়িয়া গেলেন। গাড়ীখানা তাঁহার উপর উল্টাইয়া গেল। ঘোড়ারা রাশ ছাড়া পাইয়া অন্ধকারে ছুট দিল। গাড়োয়ান একেবারে অচৈতন্য হইয়া নীচে ঠিকরাইয়া পড়িল।

হরি যে কি রকম করিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে

পারিল না। তাহার শরীরে বিশেষ কিছু আঘাত লাগে নাই, কেবল দু'এক যায়গা কাটিয়া গিয়াছিল। সে বাহিরে আসিয়া মনিব ঠাকুরাণীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভীত ও চিন্তিত হইল। গাড়ীখানা সরাইয়া যে তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিবে, বা অন্য কোন প্রকারে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে, তাহার সামর্থ্যে তাহা কুলাইবে না। হরি আশে পাশে তাকাইয়া দেখিল, কলবাড়ীর গায়েই একখানা বাড়ীর নীচের ঘর হইতে আলো দেখা যাইতেছে। সে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। অনতিবিলম্বেই জনকতক লোক আলো লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

তাহারা সকলে চেষ্টা করিয়া গাড়ী তুলিয়া তলদেশ হইতে অন্নপূর্ণাকে বাহির করিল; কিন্তু তাঁহার দেহ একেবারে অসাড়, জীবনের কোন চিহ্ন নাই। হরি ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। সে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া শিবশঙ্কর বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন ডাক্তার ডাকিতে দৌড়িল। গাড়োয়ান ইতিমধ্যে উঠিয়া বসিতেই সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া দাঁড় করাইয়া খানিকটা চলাফেরা করাইল। তাহার দেহের কোন স্থানই ভাঙ্গে নাই। সে একটু সুস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল,—"দরোয়ান বেটার দোষেই এত কাণ্ড ঘটলো!"

"কেন, দরোয়ানের কি দোষ?" তাহারা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

"বেটা মদ খেয়ে চুর হয়েছিল, ফটক খুলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফটকটা কিছুতেই ধরে রাখতে পারলে না, সেটা সজোরে এসে ঘোড়াদের গায়ে ধাক্কা লাগলো।"

ইতিমধ্যে অদূরেই মনুষ্যের দ্রুত পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সর্ব্বপ্রথমেই ডাক্তার বাবু হাতে একটা আলো লইয়া আসিয়া হাজির হইলেন, পশ্চাতে শিবশঙ্কর বাবু ও হরি। উপস্থিত লোকেরা শিবশঙ্কর বাবুকে যথারীতি অভিবাদন করিল। ডাক্তার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল,—"মশাই, ইনি একটুও নড়েন নি। যন্ত্রণায় এঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় নে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আপনারা সবাই দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান। আর হরি, তুই আলোটা ধর।"

ডাক্তার বাবুর কথা মত সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। শিব-শঙ্কর বাবু সম্মুখেই গাড়োয়ানকে আহত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সদয়ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর কি বেশী আঘাত লেগেছে?"

"আজ্ঞে না, আমার জন্যে আপনি ভাববেন না।"

শিবশঙ্কর বাবু পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি রকমে এ ব্যাপার ঘটলো? হরি বলছিল, ফটকের ধাক্কা লেগে ঘোড়া দুটো ক্ষেপে উঠে।"

"আজ্ঞে, দরোয়ানটা খুব মদ খেয়ে নেশায় বেহুঁস হয়েছিল। ফটক খুলে ধরে রাখতে না পেরে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে।"

ইতিমধ্যে ডাক্তার বাবু অন্নপূর্ণার দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রাণবায়ু বহুপূর্ব্বেই নির্গত হইয়া গিয়াছে। তিনি তখন উঠিয়া আসিয়া শিবশঙ্কর বাবুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে একটু তফাতে ডাকিয়া আনিলেন।

শিবশঙ্কর বাবু বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রকম দেখলেন? কিছু আশা আছে?"

ডাক্তার বাবু মুখ ভার করিয়া গাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন,—"না, বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে।"

শিবশঙ্কর বাবু তখন ডাক্তারের হাত ধরিয়া কাতর ভাবে বলিলেন,—"আপনি সত্যি কথা বলুন। এ সংশয়ে থাকার চেয়ে আসল কথা শুনা ভাল।"

"এক সান্ত্বনা এই যে, মাটিতে পড়া মাত্রই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নে। ঘাড়টা একেবারে ভেঙ্গে গেছে।"

শিবশঙ্কর বাবু ডাক্তারের হাত ছাড়িয়া দিয়া ভূমির উপর বসিয়া পড়িলেন। অসহ্য বেদনার একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ নৈশ সমীরণে কম্পিত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাসপুর একটি ক্ষুদ্র সহর। স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ না হইলেও মিত্রদের কলবাড়ীর জন্য ঐ অঞ্চলের অনেকেই ইহার নাম শুনিয়াছিল।

এই সহরের সর্ব্বত্রই মিত্রবংশের খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি। শিবশঙ্কর বাবুর পিতা রামদাস বাবু অতি পরিশ্রমশীল ও সৎ লোক ছিলেন। নিজের অশেষ গুণেই তিনি সামান্য ব্যবসা হইতে উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাবালক হইবার পরই পিতার সহিত কারবারে বাহির হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পবয়সেই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার তিন চার মাস পরেই রামদাস বাবুও পুত্রের অনুসরণ করিয়া ভব-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পান। তখন শিবশঙ্কর বাবুর বয়স প্রায় বিশ বৎসর হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতার মৃত্যুতে তিনিই রামদাস বাবুর বিস্তৃত কারবার ও অগাধ ধন সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তখন তাঁহাদের কলে প্রায় শতাধিক শ্রমজীবী কাজ করে। তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা রূপে গুণে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতই ছিলেন। সেই স্ত্রীর মৃত্যুতে শিবশঙ্কর বাবু প্রথম সংসার

.র দেখিলেন, তবে পুত্র কন্যার মুখ চাহিয়া অনেকটা শান্ত .গ্না তাঁহাকে স্বকার্য্যে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিতে হইল। ইতিমধ্যে শিশু কন্যাটিও দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্যামা কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া মৃতা মনিব-ঠাকুরাণীর জন্য সর্ব্বদাই এত কাতরভাবে শোক প্রকাশ করিত যে, শিবশঙ্কর বাবুও তাহার অবস্থা দেখিয়া যথার্থই দুঃখিত হইতেন এবং এই মারাত্মক দোষের জন্য তাহাকে একটি কথাও বলিতেন না।

শিবশঙ্কর বাবুর আত্মীয় বলিতে আর কেহই ছিল না। কেহ যে দু'দিন তাঁহার সংসারে আসিয়া ছেলেমেয়েকে এ সময় একটু আদর যত্ন করিবে, এমন লোকের সম্পূর্ণ অভাব। সেই জন্যই মনোরমার পরামর্শ মত কালীবাবুর সহিত যুক্তি করিয়া স্থির হইল যে, কালীবাবুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী বামাসুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যা চপলাকে সঙ্গে লইয়া কিছুদিনের জন্য শিবশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে মাতৃহীন ছেলে-মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। পরে যেরূপ সুবিধা বিবেচিত হইবে, সেই উপায়ই অবলম্বন করা যাইবে। শিবশঙ্কর বাবু বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া এ সংবাদ জানাইলেন এবং বলিয়া দিলেন বামাসুন্দরীই এখন বাড়ীর গৃহিনী হইলেন, সকলকেই তাঁহার আদেশ মত চলিতে হইবে।

যে দিন বামাসুন্দরীর আসিবার কথা, সে দিন দুপুরে শ্যামা নীরোদাকে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছিস্ নীরো, বুড়ী যে একলা আসছে তা নয়, সঙ্গে এক আইবুড়ো মেয়েও আসছে। এ যে

কেবল আত্মীয়তা জানাতে আসা তা ভাবিস্ নি, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। দেখ, আসল গিন্নীকে বরং অল্পে তুষ্ট করা যায়, কিন্তু এ সব নকল গিন্নীদের জ্বালায় অস্থির পঞ্চম হতে হয়।”

নীরোদা নিজের কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। শ্যামা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—“বাবুর হাতে মেয়েটিকে গছানই উদ্দেশ্য! এ যদি না হয়, তুই আমার নাম বদলে দিস্।”

এমন সময় শিশু কন্যাটী কাঁদিয়া উঠিল। নীরোদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিল। মাতৃহারা শিশুর আরক্ত গণ্ডস্থলে চুম্বন করিয়া নীরোদা তাহাকে শান্ত করিতে লাগিল। বিবাহের পরই নিঃসন্তান অবস্থায় সে বিধবা হয়। ফলহীন বৃক্ষের ন্যায় নিজের জীবনটাকে সে একেবারে ব্যর্থ বলিয়াই জ্ঞান করিত। শিশুর মুখের দিকে চাহিবামাত্রই তাহার চক্ষুদু’টি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে শ্যামাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিল,—“হতভাগী, কি সর্ব্বনাশই করেছিস্!”

ইতিমধ্যে মনোরমা তাহার মাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া মিত্রদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবশঙ্কর বাবু স্বয়ং তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং দুঃসময়ে তাহাদের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাইয়া

তিনি যে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়াছেন, তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন।

মনোরমা চপলাকে সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার সর্ব্বত্র ঘুরাইয়া আনিলেন। নানা মূল্যবান আসবাব-পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর দেখিয়া চপলা একাধারে বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইল। মনোরমা তাহা লক্ষ্য করিয়া ভগিনীকে বলিলেন "যদি গুছিয়ে চলতে পারিস্, এ সব এক দিন তোরই হবে। অনেক তপস্যা করলে তবে এমন স্বামী ও ধন-দৌলত ভাগ্যে জুটে। খুব সাবধান হয়ে চলবি, বুঝলি ?"

চপলা একগাল হাসিয়া উত্তর করিল,—"দিদি, সবই ত বুঝছি, কিন্তু ছেলেমেয়েটাকে দেখা শুনা করাই বড় শক্ত হবে। আমি ওসব ঝঞ্ঝাট সইতে পারি নি।"

"তা বল্লে চলবে কেন ? ঠাকুরজামাই ছেলেমেয়েকে বড় ভাল-বাসে। তাদের আদর যত্ন করলে তোর উপর খুব সন্তুষ্ট হবে।"

ভৃত্য হরি শিবশঙ্কর বাবুর প্রতি বড়ই আসক্ত। সে তাঁহার পিতার আমলের লোক ; শিবশঙ্কর বাবু তাহার সাধুতা ও সরলতা গুণে বড়ই মুগ্ধ। তিনি সকল কাজেই হরিকে বিশ্বাস করেন। হরির এ সব কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। যাঁহার অবর্ত্তমানে আগন্তুকদের এ বাটীতে অবস্থিতি আবশ্যক হইয়াছে, তাঁহার জন্যই তাহার প্রাণ কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সে ললিতের সন্ধানে গিয়া দেখিল, ললিত তাহার

মৃত মাতার ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপর শুইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতেছে। সে বালককে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—"ভাই, কেঁদ না।"

"হরি দা, আর মাকে ত দেখতে পাব না। মামার বাড়ীতে যখন শুনলাম, মা আর নেই তখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। এখানে এসে তবে আমার বিশ্বাস হয়। মাগো!" বালক হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"ভাই, চুপ কর। তোমার মা স্বর্গে গেছেন, কাঁদতে নেই।"

"কিন্তু আর ত ফিরে আসবে না, আমি তো আর তাকে দেখতে পাবো না। মাগো একবার ফিরে এস!" শোকের আবেগে বালকের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"ভাই, তিনি ত আর তোমার কাছে আসতে পারেন না। তিনি স্বর্গ থেকে তোমায় দেখা শুনা করবেন। জান, তোমার মা কেন স্বর্গে গেছেন? মৃত্যুর পর যে যায়গায় যেতে মানুষ মাত্রই কামনা করে থাকে?"

"কারণ, তিনি খুব ভাল ছিলেন।"

"কেবল তাই নয় ভাই। ভগবানের উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তোমাকেও তিনি কেবল সেই শিক্ষাই দিতেন।"

বালক অনেকটা শান্ত হইয়া ধীরভাবে উত্তর করিল,—"হাঁ।"

কিছুক্ষণ পরে ললিত পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হরিদা, দরোয়ানই বা কেমন করে ফটকটা ঘোড়াদের ঘাড়ে ফেলে দিলে ?"

সে কথা মনে হইবামাত্র রাগে হরির সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে উত্তর করিল, "ভাই, দরোয়ানটা অতি বদ্‌লোক, মদ খেয়ে নেশার ঝোঁকে ফটক ধরে রাখতে পারে নে।"

"সে নেশা না করলে বোধ হয় এ ঘটনা ঘটতো না ?"

"নিশ্চয়ই নয়, সে যদি মদ না খেত, তাহলে গিন্নীমা আজ বেঁচে থাকতেন। আমাদেরও এ দশা হতো না।"

"হরিদা, লোকে নেশা করে কেন? তুমি কি মদ খাও ?"

"না ভাই, যারা নেশা করে তারা মানুষ নয়, পশু। বিশেষ মদ খেলে তারা পশুর মতনই হয়ে যায়।"

"হরিদা, আমি কখনও নেশা করবো না।"

"ভাই, তুমি ? না, নিশ্চয়ই নয়, কখনও নয়। এখন থেকে শপথ কর, বড় হয়ে কখনও ও পাপ জিনিষ ছোঁবে না। তোমাকে খারাপ হতে দেখলে স্বর্গে গিয়েও গিন্নীমার কষ্টের সীমা থাকবে না।"

বালক উৰ্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশের দিকে একবার চাহিল, যেন সেখানে মেঘলোকের মধ্যে সে তাহার স্নেহশীলা জননীর প্রিয় মুখ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে সজোরে তাহার

মস্তক সঞ্চালন করিল। বালক হইলেও, এ অঙ্গ সঞ্চালনে তাঁহার মনের দৃঢ়তা স্পষ্ট লক্ষিত হইল। সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "না, হরিদা, আমি কখনও নেশা করবো না। আচ্ছা, একটা কথা, হরিদা তুমিও ত গাড়ীর ভেতর ছিলে, মাকে বাঁচাতে পারলে না?"

হরি বুক ফুলাইয়া উত্তর করিল,—"ভাই, যদি নিজের প্রাণ দিয়েও তাঁকে বাঁচাতে পারতাম, তোমার হরিদা তাতেও কুণ্ঠিত হতো না।"

"মামার বাড়ী থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কত দিন এখানে থাকবেন?"

"তা ত ঠিক বলতে পারি না। তাঁদের কি তোমার ভাল লাগছে না?"

"তত ভাল লাগে না।"

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল কর্ত্তাবাবু ললিতকে ডাকিতেছেন। ললিত দ্রুতপদে সে ঘর ত্যাগ করিয়া পিতার উদ্দেশে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। বামাসুন্দরী চপলাকে লইয়া শিবশঙ্কর বাবুর বাড়ীতেই আছেন। তাঁহাদের এ স্থান ত্যাগ করিবার কথা কেহই উল্লেখ করে না। আর এখানে যে তাঁহারা কিছুদিনের জন্য মাত্র আসিয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় তাঁহারাও ভুলিয়া গিয়াছেন। এ বাড়ীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মা ও মেয়ে যতদূর সম্ভব মনোরমার উপদেশ মানিয়া চলিতেছে। শিবশঙ্কর বাবুর ছেলে-মেয়েকে তাহারা খুব আদর যত্ন করিতেছে, শিবশঙ্কর বাবুর যাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট না হয়, সে দিকে তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। চাকর-বাকরদের মিষ্ট কথায় বশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের এই সদয় ব্যবহারে শিবশঙ্কর বাবু বড়ই মুগ্ধ হইলেন। মিত্র-পরিবারের সংসার-যাত্রা বিনা বাধা-বিঘ্নতে চলিতে লাগিল।

একদিন সকালে চাকরে দু'ই পেয়ালা চা লইয়া শিবশঙ্কর বাবু ও ললিতকে পান করিতে দিল; কিন্তু ললিত চায়ের পাত্র সরাইয়া দিয়া বলিল,—"আমাকে চা কেন? আমি ত চা খাই না।"

নিকটেই বামাসুন্দরী বসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,

—"খাও না, আজ একটু খাও, চা খেতে কিছু দোষ নেই।" পরে শিবশঙ্কর বাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চা খেতে আর দোষ কি ?"

শিবশঙ্কর বাবু উত্তর করিলেন, —"ইচ্ছে যায় ত খাক্ না।" তাঁহার স্ত্রীর ন্যায় তিনি ছেলেদের আহার সম্বন্ধে অতটা শাসন প্রিয় ছিলেন না; এ সম্বন্ধে স্ত্রীর উপরই সকল ভার চাপাইয়া তিনি একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন।

শিবশঙ্কর বাবুর উত্তরে ভরসা পাইয়া বামাসুন্দরী পুনর্ব্বার ললিতকে বলিলেন,—"খাও না, তোমার বাবা ত খেতে বলেছেন।"

"না" এই বলিয়া ললিত পাত্রটি চাকরের হাতে তুলিয়া দিল। শিবশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"চা খেতে এত নারাজ কেন ?"

"বাবা আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, কখনও চা পান করবো না।"

"কেন ?"

"মামার বাড়ী থেকে মা চলে আসবার সময় তাঁর কাছে আমি এ বিষয় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সেই কথাই তাঁর শেষ কথা। মা স্বর্গ থেকে এখন আমাকে নিশ্চয়ই দেখছেন।" এই বলিয়া সে হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মায়ের কথা স্মরণ হইবামাত্র তাহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল।

শিবশঙ্কর বাবুও যেন একটু বিচলিত হইয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বামাসুন্দরীকে বলিলেন,—"আপনি ওকে আর চা খেতে দেবেন না।" বামাসুন্দরী তাঁহার কথায় সায় দিলেন, কিন্তু মনে মনে ললিতের উপর এত চটিয়া গেলেন যে, সে সময় তাহাকে উত্তম মধ্যম দু' ঘা প্রহার করিতে পারিলে তাঁহার গায়ের ঝাল অনেকটা মিটিত।

এই ভাবেই দু'চার মাস কাটিয়া গেল। একদিন দুপুরে হঠাৎ মনোরমা শিবশঙ্কর বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবশঙ্কর বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না, তাঁহাকে কলবাড়ী হইতে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি বাড়ী আসিলে মনোরমা গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—"একটা বিশেষ কথা আছে; দেখ, এই চপলা সমত্ত মেয়ে, তোমাদের বাড়ীতে অনেক দিন ধরে আছে, লোকে খারাপ কথা বলছে। মেয়েমানুষের সুযশ পদ্মপত্রে জলের মত টলমলে; বিশেষ আইবুড়ো মেয়ে, একটু বদনাম হলেই আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। তাই তোমার কাছে এসেছি। এর একটা উপায় করা উচিত। আমি দূরে থাকি, সেখানেও এ কথা পৌঁছেছে। মা ও বলছিলেন, পাড়ার লোকেরা এই ব্যাপার নিয়ে কেবল কানাঘুসো করছে।"

শিবশঙ্কর বাবু এ কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি ধীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"দেখুন, আমার কানে ত এ রকম কোনও কথা এ পর্য্যন্ত উঠে নি; কিন্তু

আপনারা যখন বলছেন, তা অবিশ্বাসও করতে পারি না। কি প্রতিকার করলে হয়, বলুন। একে ত আপনারা আমার স্ত্রীর আত্মীয়, তার উপর এতদিন আমাদের যে উপকার করেছেন, তার ঋণ আমরা কখনও শুধতে পারবো না। আপনাদের মনে কোনও কষ্ট দিই তা আমার একেবারেই ইচ্ছে নয়।”

মনোরমা হাসিয়া উত্তর করিলেন—“তোমার যে গুণের তুলনা নেই, তা আমরা জানি। এর ত সহজ উপায়ই পড়ে রয়েছে ভাই। চপলা তোমার ছেলেমেয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে পড়েছে যে, তারাও তার নাম করতে পাগল। সেও বলছিলো যে ললিত ও সুরমাকে ছেড়ে যেতে তার প্রাণ ফেটে যাবে। তুমি আমার বোনকে চরণে একটু স্থান দিলেই সব দিকেই সুবিধা হবে।”

শিবশঙ্কর বাবুর ভাবিবার অবসর ছিল না। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চপলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

শুভ বিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া গেল। কালীবাবুর বাড়ী হইতেই বিবাহ হইল। মনোরমাই বরের ঘরের পীসি ও কনের ঘরের মাসী সাজিয়া বিবাহের সব আয়োজন করিয়াছিলেন। শিবশঙ্কর বাবু বিবাহের পর দিন চপলাকে স্ত্রীরূপে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বামাসুন্দরীও তাহার দু’চার দিন পরেই জামাই বাড়ী দেখা শুনা করিতে আসিলেন, ছেলেমানুষ মেয়ে একলা

সংসার চালাইতে পারিবে কেন? তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। খেলায় তাঁহাদেরই বাজি জিত হইয়াছে।

চপলা এখন আসল গিন্নী হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার সে কোমল স্বভাব, মিষ্ট কথা, সকলের প্রতি আদর যত্ন যেন যাদুকরের মায়ার দ্বারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সে এখন কেবল শিবশঙ্কর বাবুরই সুখের প্রতি লক্ষ্য করে, ললিত ও সুরমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসে না, দাস দাসীকে প্রতিকাজেই তিরস্কার করে; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বামাসুন্দরীকে এ সুখ বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে ভবের খেলা সাঙ্গ করিতে হইল। শিবশঙ্কর বাবুই মহাসমারোহে শ্বাশুড়ীর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

একদিন দুপুরবেলা চপলা ঘুমাইলে, শ্যামা নীরোদাকে ডাকিয়া বলিল,—"দেখেছিস্, যা বলেছিলাম ঠিক তা ফলে গেল। আমি আগেই শুনে বলেছি যে, আইবুড়ো মেয়েকে গছাবার উদ্দেশ্যেই বুড়ীর এখানে আসা। বাবু শিবতুল্য লোক, ওদের কু অভিসন্ধি বুঝতে পারেন নি। আমি তবু ঠারে ঠোরে দু'চার বার বাবুকে ও কথা বলেছি, কিন্তু যাঁর নিজের মনে পাপ নেই, তিনি বুঝবেন কি করে? ওদের এ বাড়ীতে আসবার পূর্ব্বে বাবু যেদিন বল্লেন ললিতের মামীমার মা আসছেন, তাঁর কথা মত তোরা চলবি, আমি তখনই বলে ফেলেছিলাম, উনি কি আমাদের গিন্নীমার

বদলে আসছেন? বাবু তাতে কত দুঃখিত হয়ে উত্তর দিলেন শ্যামা, তার সঙ্গে আর কারও তুলনা করিস্ নি, তার আসন এ বাড়ীতে চিরদিনই শূন্য থাকবে।"

নীরোদা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা শ্যামা দিদি, বাবু এত শীগ্‌গির কেন আবার বিয়ে করলেন?"

"ওই বুড়ীবেটীর আর তাঁর মেয়ের কারসাজি। তবে শোন, তুই কাকেও বলিস্ নি। বের আগে যেদিন খোকাবাবুর মামীমা এসে বাবুর সঙ্গে কথা কন, আমি ঘরের বাইরে আড়ি পেতে সব শুনেছি। মামীমা বাবুকে বল্লেন, চপলা সমত্ত মেয়ে, এতদিন এ বাড়ীতে আছে বলে পাড়ার লোকেরা সব নিন্দে করছে। সে কথা তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছেছে, তাই তিনি বাবুকে ধরে বসলেন, এ বিপদ থেকে উদ্ধার হবার একমাত্র উপায় বাবুর চপলাকে বিয়ে করা। বাবু নিরীহ লোক, তাতেই বিশ্বাস করে, বাধ্য হয়ে তাঁর কথায় তথনই সম্মত হন।"

"আচ্ছা শ্যামা দিদি, আমরা ত পাড়ার সব বাড়ীতেই ঘুরি, এ কথা ত কোথায় শুনি নি। আমরা কেউ শুনলাম না, আর মামীমা অতদূরে থাকেন, তাঁর কাণে গেল, এও কি বিশ্বাস হয়?"

"সব সাজান, বুঝতে পারছিস্ না? সহজে বল্লে বাবু ত বিবাহে সম্মত হতেন না, তাই চালাকি করে এই সব মিথ্যে কথা সাজান। আমরা গরিব, ইতর লোক, আমাদেরও যা ধর্ম্ম ভয়

আছে, ওদের তাও নেই। এত ধর্ম্মে সইবে কেমন করে, তা বুঝতে পারছি না। এ আগাগোড়া সবই মতলব এঁটে কাজ করা, মাকড়সাতে যেমন মাছি ধরতে জাল পাতে, বুঝলি!"

"আর দেখেছ, নূতন গিন্নী আগে আমাদের কত মিষ্ট কথা বলতেন, ছেলেমেয়েকে কত যত্ন করতেন, এখন একেবারে ভিন্ন মূর্ত্তি ধরেছেন।"

"আমি তা সহ্য করবো না। সেদিন নতুন গিন্নী বিনা দোষে আমাকে তিরস্কার করেছিলেন, আমি তখনই সে কথা বাবুকে বলে চলে যেতে চেয়েছিলুম; বাবু বল্লেন, তুই এতদিনের লোক, এই সামান্য একটা কথায় এত রাগ করলি? তুই গেলে খুকীর দশা কি হবে? খুকীর কথা মনে পড়তেই আমার চৈতন্য হলো, কি করছি। আমারই দোষে আজ ওর এই দুরবস্থা, আর আমিই ওকে ফেলে যেতে চাচ্ছি! ও যতদিন না বড় হয়, ততদিনই আমি এখানে আছি, তার পরই পিট্টান। আর দেখছি এই ছেলেমেয়ে নিয়েই নতুন গিন্নীর সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রায় আমার খুটি নাটি চলবে।"

এইখানেই সে দিনের মত তাহাদের আলোচনা শেষ হইল। নীরোদা যথাসময়ে এই সব কথা হরির কর্ণগোচর করিল। হরি গম্ভীরভাবে সব শুনিয়া বলিল,—"নীরো, শ্যামা যা বলেছে, আমারও মনে তাই সন্দেহ হয়। এত তাড়াতাড়ি

বাবু বে করাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গেছলাম ; কিন্তু তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, এ সব কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ শুনতে না পায়।" নীরোদা তাহার কথায় সায় দিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সময়-ক্রমে মিত্র-পরিবারের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। চপলার বিবাহের পূর্ব্বের অবস্থার সহিত পরের অবস্থার অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহার সে ধীর মেজাজ ও নম্র স্বভাব আর নাই। এ পরিবর্ত্তন সময় সময় শিবশঙ্কর বাবুর নজরেও পড়িত; তবে তিনি খুব শান্ত ও মৃদুস্বভাব লোক ছিলেন বলিয়া সংসারের সকল বিষয় গ্রাহ্য করিতেন না। অধিকাংশ সময়ই বাহিরে কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। তবে ললিত ও সুরমার সুখ-বিধানের উপর তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এদের লালন-পালনের ভার চপলার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

ললিতের মেজাজও তাহার পিতার ন্যায় অতীব ধীর। সে চপলাকে যথাযোগ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিত। যদিও সব বিষয়ে সে তাহার নূতন মাতার সহিত একমত হইতে পারিত না, বা তাঁহার আদেশানুযায়ী সব কাজ করিতে পারিত না, তথাপি কখনও সে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নাই। তাহার মাতার নিকট যেরূপ শিক্ষা শৈশবাবধি সে পাইয়াছিল, সেই আদর্শেই বয়োবৃদ্ধির সহিত নিজের চরিত্র সে

গঠন করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার কার্য্যের উপর শিবশঙ্কর বাবুর অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কোনও কাজ তাহাকে করিতে বলিতেন না। কোনও বিষয়ে চপলার সহিত ললিতের মতদ্বৈধ হইলে, তিনি প্রথম প্রথম ললিতকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু প্রতিপদেই প্রায় সে উত্তর দিত যে ইহা সে তাহার মৃত মাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে এবং ইহার বিপরীত কাজ সে প্রাণ থাকিতে সম্পন্ন করিতে পারিবে না; এই উত্তর শুনিয়াই শিবশঙ্কর বাবু সন্তুষ্ট হইতেন, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিতেন না, বরং চপলাকেই বলিয়া দিতেন, ললিতের কাজে সে যেন কখনও প্রতিবাদ না করে। মৃত মাতার আদেশ বা উপদেশ শৈশবের ন্যায় এখনও সে বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত এবং কাহারও কথায়, এমন কি শিবশঙ্কর বাবুর প্রস্তাবেও সে তাহা লঙ্ঘন বা অগ্রাহ্য করিত না। ইহাতে চপলা তাহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইত, মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও, ভিতর ভিতর গুমরাইতে থাকিত এবং তাহার মৃত মাতার উদ্দেশে মিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিত। শিবশঙ্কর বাবু ভাবিতেন চপলার শরীর আজকাল অসুস্থ, সেই জন্যই বোধ হয় তাহার মেজাজও কড়া রকমের হইয়া উঠিয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে সে এ রকম প্রকৃতির ছিল না; কিন্তু শ্যামা দাসীর নিকট চপলার এ ব্যবহার মধ্যে মধ্যে বড়ই অসহ্য ঠেকিত। সে তখন বাবুর সম্মুখেই নূতন গিন্নীর দোষ

দেখাইয়া বিড়বিড় করিয়া বকিত। এই লইয়া চপলার সহিত শ্যামার বড় সদ্ভাব ছিল না, দু'জনের মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি চলিত।

বিবাহের দুই বৎসর পরে চপলা এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। চপলা শ্যামার উপরই তাহার পালনের ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু শ্যামা সুরমাকে ছাড়িয়া শিশুর ভার লইতে সম্মত হইল না। চপলাও তখন গোঁ ধরিয়া বসিল, তাহার কথা মত কাজ না করিলে শ্যামার এ বাটীতে থাকা আর পোষাইবে না; কেবল সুরমার জন্যই শ্যামার ভাবনা, নচেৎ বহুদিন পূর্ব্বেই সে স্বেচ্ছায় এ বাটী ত্যাগ করিত। নিজেরই দোষে যাহাকে সে শৈশবাবস্থায় মাতৃহীনা করিয়াছে, তাহাকে কোন প্রাণে সে এখন এই মমতাহীন সংমার হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া যাইবে? সে ভাবিল, নূতন গিন্নীর আদেশ মত শিশুরই সেবার ভার গ্রহণ করা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। তাহা হইলে সময় সময় সুরমারও সে তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে। পরে সুরমা বড় হইলেই সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

একদিন সন্ধ্যার পর ব্যাপার বড়ই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। শিবশঙ্কর বাবু সেদিন বাড়ী ছিলেন না, বিশেষ কোনও কার্য্যবশতঃ বিদেশে গিয়াছিলেন। চপলার শরীর-গতিক সেদিন বড়ই মন্দ ছিল। সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। শ্যামা শিশু পুত্রকে লইয়া তাহার পার্শ্বের ঘরেই

শুইয়াছিল। চপলা তাহার ঘর হইতে শুনিতে পাইল, শিশুপুত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া চীৎকার করিতেছে, শ্যামার কোনও সাড়া-শব্দ নাই। চপলা রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া আসিয়া দেখিল, শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া নীলমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, শ্যামা সুরমাকে লইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তাহার কোনও চৈতন্য নাই। চপলা শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া শ্যামার দিকে তাকাইয়া চেঁচাইয়া বলিল,—"শ্যামা এমন করে ঘুমুচ্ছিস্, ছেলে যে কেঁদে ককিয়ে গেল!" চপলার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নীরোদা দ্রুতপদে ঘরের ভিতর আসিয়া হাজির হইল।

চপলার কথা শ্যামার কর্ণে পৌঁছিল না। সে তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। গত রাত্রে সুরমার অসুখ করায় সারা রাত্রি তাহার ঘুম হয় নাই। তাই আজ সন্ধ্যার পরই একটু শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চপলা তখন সজোরে তাহার হাত ধরিয়া নাড়া দিল। শ্যামা ধড়ফড়িয়া উঠিয়া বসিল। চপলা সপ্তমে গলা চড়াইয়া তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, —"এত সুখের গতর হলে কি দাসীগিরি করা চলে? সন্ধ্যে না হতে হতেই পেয়ারের মেয়েকে নিয়ে ঘুম হচ্ছে! এদিকে ছেলেটা যে ককিয়ে মারা গেল, তা নজর নেই।"

শ্যামা এত শীঘ্র ঘুমাইবার কারণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, কিন্তু চপলা তাহাতে শান্ত হওয়া দূরের কথা, আরও রাগিয়া চেঁচাইয়া বলিল,—"আমি তখনই তোকে বলেছিলুম যদি আমার

ছেলের সেবা করতে না পারিস্, পথ দেখ। আদরের মেয়েকে দেখবার জন্যে আমি তোকে রাখি নি। কাল থেকে হয় আমার ছেলেকে দেখবি, নয় দূর হয়ে যাস্।”

শ্যামা সামান্য দোষে এ তীব্র তিরস্কার সহ্য করিতে পারিল না। সে রাগে জবাব দিল,—“শরীর গতিক সবার রোজ সমান যায় না। তোমার শরীর এই যে ভাল নয় বলে সন্ধ্যের সময়ই শুয়ে পড়েছ, আমরা দাসী বলে কি, চোর দায়ে ধরা পড়েছি। তোমাকে বলতে হতো না, অনেকদিন আগেই আমি এ বাড়ী ছাড়তুম, কেবল খুকীর জন্যেই যেতে পারি নি।”

সামান্য দাসীর মুখে এ উত্তর শুনিয়া চপলা রাগে চোখে কাণে দেখিতে পাইল না। সে শ্যামার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—“বেরোও, এখনি আমার বাড়ী থেকে বেরোও। যত বড় মুখ তত বড় কথা!”

শ্যামা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে ঘর ত্যাগ করিল। পরে তাহার কাপড়-চোপড় সামান্য যাহা কিছু ছিল পোটলা বাঁধিয়া রাত্রেই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় কেবল নীরোদাকে বলিয়া গেল,—“আমি ত চল্লুম, তুই সুরমাকে দেখিস্। আর কর্ত্তাবাবু এলে তাঁকে বলিস্ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই চলে যাচ্ছি।” বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ জল পড়িতে লাগিল। সুরমাকে চপলার হাতে ফেলিয়া যাইতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু এত অপমান সহ্য করিয়া

এ বাড়ীতে তিলমাত্র থাকিতে তাহার ইচ্ছা যাইতেছিল না। সে সকল মায়া কাটাইয়া পশ্চাতে না তাকাইয়া চলিয়া গেল। সুরমা তখন ঘুমাইতেছিল, কিছুই টের পাইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া শ্যামার অনুসন্ধান করিতে গিয়া সে যখন শুনিল যে শ্যামা চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না, সে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চপলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"যাও না, এত আদরের শ্যামা দিদি যদি, তার কাছেই যাওনা। আমাকে আর জ্বালাও কেন?"

তিন দিন পরে শিবশঙ্কর বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীতে পা দিবামাত্র চপলা তাঁহার নিকট শ্যামার অন্যায়ের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিল। ভাবিল, আমি যাহা বলিব কর্ত্তা তাহাই নিশ্চয় বিশ্বাস করিবেন। শ্যামাকে তাড়াইয়া দিবার পর চপলার রাগ একটু কমিলে, তাহার মনে ভয় হইয়াছিল পাছে এতদিনের পুরাতন বিশ্বাসী ঝিকে তাড়াইয়া দেওয়ায়, কর্ত্তা চটিয়া যান। শিবশঙ্কর বাবু ব্যাপার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বটে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। তিনি বিশ্রামান্তে কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। যাইবার সময় পথে নীরোদার সহিত তাঁহার দেখা হইল। নীরোদা সুরমাকে লইয়া বেড়াইতেছিল। বাবাকে দেখিয়া সুরমা কোলে উঠিবার জন্য তাহার হাত বাড়াইয়া দিল। শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে কোলে লইয়া নীরোদাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নীরো, শ্যামার হয়েছিল কি? তার ও রকম মতিগতি কবে থেকে হলো?"

নীরোদাকে নিরুত্তর দেখিয়া শিবশঙ্কর বাবু পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি সত্যি সত্যিই তোর গিন্নীমাকে মেরেছিলো?"

"না, সে ত মারে নি। গিন্নীমাই বরং"—নীরোদা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল।

"তোর গিন্নীমা কি করেছিলো? বল না, থামলি কেন? আমি সব ঘটনা সঠিক জানতে চাই।"

"গিন্নীমাই তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে সে গিন্নীমার মুখে মুখে চোপরা করেছিল। অতটা করা তার ভাল হয় নি।"

"সে গেল কোথায়?"

"তা ত জানি না। পরদিন থেকে আর তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

শিবশঙ্কর বাবু আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সুরমাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবশঙ্কর বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্যামার কোনও সংবাদ পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, বেচারী বোধ হয় এতদিনের আশ্রয়-স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করিয়াছে। অবশ্য এ মনোভাব তিনি আর

কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। যাহা হউক্ প্রায় মাস-খানেক পরে শ্যামার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। সে এখন হাওড়ায় তাহার ভায়ের নিকট আছে। শিবশঙ্কর বাবুর নিকট তাহার প্রায় দুইশত টাকা জমা ছিল। সেই টাকা ও তাহার প্রাপ্য মাহিনা পত্রে সে চাহিয়া পাঠাইয়াছে। শিবশঙ্কর বাবু টাকা পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দিলেন, কিন্তু সে পত্রের আর কোনও উত্তর আসিল না।

*　　*　　*　　*　　*

শ্যামা সে রাত্রে মিত্রদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে ষ্টেসনে গিয়া হাজির হইয়াছিল। পরে ট্রেনে চড়িয়া হাওড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। হাওড়ায় তাহার ভায়ের দোকান ছিল, সেখানে গিয়া দেখিল দোকান পাট সব উঠিয়া গিয়াছে। সে ঘরে নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। সেখানে অনেক খোঁজ করিয়া শ্যামা তাহার ভায়ের নূতন ঠিকানা জানিয়া লইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল।

পথে যাইতে যাইতে সে গঙ্গার ধারে বড় বড় কলবাড়ী দেখিতে পাইল। তাহাদের গায়েই দেখিল একখানা বড় ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে, অনেক লোক বসিয়া সেখানে হাল্লা করিতেছে। একটু লক্ষ্য করিয়াই সে বুঝিতে পারিল, সেটা শুঁড়ি-খানা। ভিতরে যাহারা বসিয়া রহিয়াছে, অধিকাংশেরই

পরিধেয় বসন মলিন ও ছিন্ন, দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কোটরগত, মুখ চড়াইয়া গিয়াছে, যেন কোনও কঠিন রোগে তাহারা ভুগিতেছে। সকলেই ধান্যেশ্বরীর সেবা করিতেছে, অভদ্র ভাষায় পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছে ও সমস্বরে অশ্লীল গান গাহিতেছে। শ্যামা কানে আঙ্গুল দিয়া অনেক কষ্টে সে স্থানটা পার হইল। কিছুদূর আসিয়া সে আবার একটা মদের দোকান লক্ষ্য করিল। "আবার একটা!" সে ভয়ে ও বিস্ময়ে চেঁচাইয়া উঠিল। পরে যে অঞ্চলে তাহার ভাই নূতন বাসা লইয়াছে, সেখানে নানা পথ ঘুরিয়া আসিয়া অনেক কষ্টে উপস্থিত হইল। স্থানটা এতই অপরিষ্কার যে, তাহা কিরূপে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইতে পারে, শ্যামা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার ভায়ের যে এতদূর অবনতি হইয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সেখানে একখানি মাত্র ঘর ভাড়া করিয়া তাহার ভাই স্ত্রী ও চারিটি সন্তান লইয়া বাস করিতেছে।

ঘরে ঢুকিয়াই ভায়ের স্ত্রীকে দেখিয়া সে প্রথম চিনিতে পারিল না। দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে তাহার সুন্দর চেহারার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল! সে শ্যামাকে আদর যত্ন করিয়া বসাইল। ছেলে মেয়েরা পীসি আসিয়াছে শুনিয়া তাহার চারিদিকে জড় হইল। তাহাদের সকলের মলিন বসন, রুক্ষ মাথা ও কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া দুঃখে শ্যামার অন্তঃকরণ ফাটিয়া

য়াইতে লাগিল। সে জানিত ভায়ের দোকান বেশ ভাল চলিতেছে, তাহারা সকলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, কিন্তু তাহাদের যে এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা ত সে ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই। সে বৌকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌ, এমন হলো কেন? তোরা এখানে আছিস্ কেমন করে?"

বৌ চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল,—"দিদি, প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো, এখন সহ্য হয়ে গেছে। মদ খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলেছে। দোকান গেল, এখন কলে চাকরি করছে। যা পায়, অর্দ্ধেক মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়, ছেলেমেয়েদের পেটে ভাত, [illegible] কাপড় জোটে না।"

"কই দোকান যে উঠে গেছে সে সব কথা ত আমাকে জানায় নি! হেরো গেল কোথা? এখনও কল থেকে বাড়ী আসে নি?"

"দিদি, আজ শনিবার মাইনে পেয়েছে, নিশ্চয়ই শুঁড়ির দোকানে ঢুকেছে!"

শ্যামার নয়ন-সম্মুখে শুঁড়ির দোকানের সেই বীভৎস চিত্র উদিত হইবামাত্র, তাহার সমস্ত দেহ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে দৃশ্য সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। তবে কি তাহার ভাইও তাহার মধ্যে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে? শ্যামা হাতে মুখে জল দিয়া একটু শান্ত হইল। বৌ তখন বাহিরে আসিয়া রান্নার যোগাড় দেখিতে লাগিল। তাহার হাতে এমন একটি

পয়সা নাই যে, এক পয়সার বাতাসা কিনাইয়া আনিয়া শ্যামাকে জল খাইতে দেয়। শ্যামার বড় ভাইপো পীসির পাশেই বসিয়াছিল।

শ্যামা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই ত একখানা ঘর, তোরা সব ঘুমুস্ কোথা ?"

"এই ঘরেই সবাই শুই। আমরা তিনজন বড় তক্তপোষের ওপর শুই, তার নীচে মা, বাবা ও খুকী থাকে।"

"কি রকম করে থাকিস্ তোরা ?" বলিতে বলিতে শ্যামার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

"আমরা তবু ত একরমকম আছি, আমাদের পাশের ঘরে যারা থাকে তারা আবার আট জন। পাঁচ জন ওপরে শোয়, তিনজন নীচে!"

শ্যামা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, চুপ করিয়া রহিল। এমন সময় তাহার ভাই হারাধন ছেঁড়া কাপড় চোপড় পড়িয়া মদের নেশায় টলিতে টলিতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামাকে ঘরেব ভিতর দেখিয়াই সে ভয়ে একটু জড়সড় হইয়া গেল এবং নিজেকে অনেকটা সংযত করিয়া লইল। শ্যামা তাহার অবস্থা সম্যক অবগত হইল; কিন্তু প্রথম দিনই আর কোনও অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এতকাল পরে ভ্রাতা ভগিনীর মিলন-সুখকে বিষময় করিয়া তুলিতে সে ইচ্ছা করিল না। বৌ ঠিকই বলিয়াছিল, হারাধন সেদিন এক সপ্তাহের মাহিনা

খাইয়া মদের দোকানে বন্ধুদের সহিত স্ফূর্ত্তি চালাইতেছিল। যাহা হউক্ সামান্য যাহা কিছু ফেরত আনিয়াছিল, তাহা হইতেই দিদির আহারের যোগাড় করিবার জন্য সে বাজারে বাহির হইল। রাত্রে আহারাদির পর দিদির নিকট সে ব্যবসায়ে লোকসান হইবার নানা কারণ দেখাইল, কিন্তু মূল কারণ যে মদ্যপান তাহা বুঝিয়াও তাহার নিকট গোপন রাখিল।

হারাধন তখন শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, বাবুরাও কি কলকাতায় এসেছে নাকি ?"

"না, আমি তাদের কাজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"কাজ ছেড়ে দিয়েছ ? এতদিনের পুরাণো মনিব !"

"আমাদের গিন্নীমা মারা গেছেন। নতুন গিন্নীর সঙ্গে আমার বনলো না।"

শ্যামা সকালে উঠিয়া স্থানটি একবার ভাল করিয়া ঘুরিয়া আসিল। সমস্ত স্থানটিই ভয়ঙ্কর অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর। পাশাপাশি দশ বারখানি খোলার ঘর, এক এক ঘরে পাঁচ ছয় হইতে আরম্ভ করিয়া আটদশ জন পর্য্যন্ত লোক বাস করে। প্রত্যেক ঘরেই লক্ষ্মীছাড়ার সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান। সকলের অবস্থাই ঠিক সমান। শ্যামা আরও সংবাদ লইয়া জানিল যে, অধিকাংশ ঘরেরই গিন্নী কর্ত্তার বিবাহিতা স্ত্রী নহে, অথচ তাহারা স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বাস করিতেছে, সকলেরই এক পাল ছেলে পিলে। পুরুষেরা সবাই কলে চাকরী করে। গড়ে প্রত্যেকে সপ্তাহে পাঁচ

ছয় টাকা উপার্জ্জন করে। নিজেদের অবস্থা মত থাকিলে ইহাতেই তাহাদের সংসার-যাত্রা একপ্রকার চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু কর্ত্তারা সকলেই মদ্যপায়ী, যাহা উপার্জ্জন করে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক শুঁড়ির দোকানে উড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। স্ত্রীরা কান্নাকাটি করে, গালাগালি দেয়, কখনও ছেলে-পিলে লইয়া অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করে, কিন্তু কর্ত্তাদের পেটে আহার জুটুক আর নাই জুটুক মদ চাই-ই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কঠোর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে, অথচ ভীষণ দারিদ্র্য-রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া নিষ্পেষিতও হইতেছে!

এই সব লক্ষ্য করিয়া ইহাদের জন্য শ্যামার কোমল প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইহাদের এরূপ দুরবস্থার একমাত্র কারণ,—মদ্যপান। প্রথম একটু একটু পান করিতে লোকেরা অভ্যস্থ হয়, পরে পানের মাত্রা দিন দিন বাড়িতে থাকে। তখন নিজের সর্ব্বনাশ হইতেছে বুঝিতে পারিলেও সে পাপ প্রলোভনের হাত হইতে দুর্ব্বলচিত্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির উদ্ধার পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। শ্যামা স্থির করিল সহরের এই সব মদের দোকানই লোকেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ভাল লোকেরা সরকার হইতে আইন পাশ করিয়া পাপ দোকান-গুলো উঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করে না কেন?

আচ্ছা, এই হতভাগ্য লোকেদেরও কি নিজেদের অবস্থা উন্নত

করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না? অধঃপতনের এই পঙ্কিলময় স্তর হইতে নিমেষের জন্যও উপরে উঠিয়া হাঁফ্ ছাড়িবার আকাঙ্খা কি একবারও ইহাদের প্রাণের মধ্যে উদিত হয় না? এই নীচ প্রবৃত্তির তাড়নার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ কি ইহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব? মদ্যপানের অভ্যাস কি তাহাদের দৈনিক জীবন-যাপনের সহিত এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে? ইহাদের মধ্যে দু'চার জনও ভদ্রবংশের সন্তান রহিয়াছে, তাহাদের অবস্থাও একসময় বেশ স্বচ্ছল ছিল; কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে, সে অতীত জীবনের কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। কি পাপের ফলে ইহারা এরূপ দুরবস্থায় উপনীত হইল? তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা স্মরণমাত্র তাহাদের সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। ইহার একমাত্র কারণ,—মদ্যপান!

শ্যামা ভায়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। মদ্যপানই যে তাহার অবনতির একমাত্র কারণ তাহাও সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। পরে চিন্তা করিয়া স্থির করিল, তাহার যাহা পুঁজিপাটা আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ভাইকে পুনর্ব্বার দোকান করিয়া দিবে এবং তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। হারাধনও দিদির নিকট এরূপ প্রস্তাব করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল ভবিষ্যতে মদ সে আর কখনও স্পর্শ করিবে না। শ্যামা শিবশঙ্কর বাবুর নিকট হইতে তাহার গচ্ছিত টাকা চাহিয়া পাঠাইল। টাকা আসিবামাত্র সে ভাইকে এক মুদিখানার

দোকান করিয়া দিল এবং সে ঘর ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল একখানি ছোট খোলার বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা মনোযোগের সহিত দোকান চালাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ললিত গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার পরই, শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া তাহার পড়াশুনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। চপলার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ললিত আপনাকে অনেকটা মুক্ত বলিয়া ভাবিল। শিবশঙ্কর বাবুও স্ত্রীর হাত হইতে পুত্রের শাসন ও লালন-পালনের ভার চলিয়া যাওয়ায় বড় সুখী হইলেন। সুরমারও তিনি বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভদ্রবংশের সচ্চরিত্রা এক দরিদ্র বিধবাকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন; চপলা এত খরচ অসঙ্গত ও অনাবশ্যক বলিয়া প্রথম ইহাতে খুব আপত্তি করিল কিন্তু শিবশঙ্কর বাবু "তোমার সময়ও নেই, শরীরও খারাপ।" এই বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতেও সে এ অযথা খরচ বাড়াইতে সম্মত হইতে পারিল না; পরে কর্ত্তাকে এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সে নিরস্ত হইল। সুরমাও অধিকাংশ সময় এই স্ত্রীলোকের সহিত অতিবাহিত করায় চপলার শাসন-ভার হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইল।

চপলার পুত্রের নাম রাখা হইয়াছে শিশিরকুমার। শিশির

এখন পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার লালন-পালনের ভার চপলার হস্তেই ন্যস্ত। ছেলেকে কি রকমে মানুষ করিতে হয়, সে বিষয়ে চপলা একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল। ললিত চা খাইত না বলিয়া তাহার উপর টেক্কা দিয়া চপলা শিশিরকে ললিতের সম্মুখেই প্রত্যহ দু'বাটি চা খাইতে দিত। এই অল্প বয়স হইতেই সে পুত্রকে সদাসর্ব্বদা মূল্যবান সাদা ধবধবে পোষাকে 'বাবু' সাজাইয়া রাখিত। ছেলে যখন যা বায়না ধরিত, মা তখনই তাহা পূরণ করিয়া দিত। শিবশঙ্কর বাবু সে বিষয়ে কোনও অনুযোগ করিলে চপলা উত্তর দিত,—"বড় লোকের ছেলেরা ঐ রকম ভাবেই থাকে।" ললিতকে লক্ষ্য করিয়াই সে এ কথা বলিত। শিবশঙ্কর বাবু পূর্ব্বেও যেমন এ সব বিষয় তত গ্রাহ্য করিতেন না, এখনও সেরূপ উদাসীন ছিলেন। তবে তখন অন্নপূর্ণার পালনগুণে ললিতকুমার সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিক্ষা পাইয়াছিল।

অন্নপূর্ণা জানিতেন সন্তানকে কিরূপ মানুষের মত করিয়া মানুষ করিতে হয়, তাই বাল্যকাল হইতেই সন্তানের শিক্ষার উপর এত তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ দুপুরে আহারাদির পর ললিতকে লইয়া মহাভারত রামায়ণ হইতে পড়িয়া গল্প শুনাইতেন, খ্যাতনামা মহাত্মাদের জীবনীকথা বর্ণনা করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে কোন লোকটা ভাল, কোন লোকটা মন্দ, কোন কাজ করা উচিত, কোনটা অন্যায় তাহাও বুঝাইয়া দিতেন।

তাঁহার নিজের মধুর স্বভাব, মিষ্ট কণ্ঠস্বরের গুণে পুত্র স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। প্রত্যহ রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে তিনি ললিতকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিক্ষা দিতেন। দিনের মধ্যে যখনই সুযোগ পাইতেন, তিনি পুত্রের কোমল অন্তঃকরণে সদ্‌গুণের বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইতেন, এ সংসারে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, এই অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে তাহার সকল কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা হইলে মৃত্যুকে আর ভয় করিতে হইবে না, মৃত্যুর পরও তাহার সুযশে সংসার পূর্ণ থাকিবে। তিনি মরিবার পূর্ব্বেই ললিতের সরল অন্তঃকরণে এই সব সুশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্বভাব-চরিত্র সেই আদর্শেই গঠিত হইয়াছিল। ললিতও বুঝিয়াছিল, এ সংসারে তাহার উপর গুরুতর দায়িত্বভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেই হইবে, বর্ত্তমানে যেমন কাজ করিবে ভবিষ্যতে তেমনই ফল সে ভোগ করিতে পাইবে। তাহার বিমাতার শত চেষ্টাও তাহার মন হইতে এই সব ভাব দূর করিতে পারে নাই। মৃত মাতার প্রতি তাহার ভালবাসা ও ভক্তি এত গভীর ছিল যে, তাঁহার উপদেশের বিরোধী কোন কাজে সে কখনও হস্তক্ষেপ করিত না; কিন্তু শিশিরকুমারের কথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

চপলা অবশ্য সর্ব্বদাই তাহার পুত্রের মঙ্গল কামনা করিত, কিন্তু পুত্রকে কি উপায়ে সৎশিক্ষা দিতে হয়, তাহা সে জানিত না।

সাংসারিক উন্নতির প্রতিই সে বিশেষ লক্ষ্য রাখিত। সংসারে পুত্র খুব ধনী ও বড় লোক হইবে, সবাই তাহাকে খাতির যত্ন করিবে, সেটা চপলা খুব আশা করিত; কিন্তু অতিরিক্ত আদর দিয়া তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। পুত্রের স্বভাব-চরিত্র গঠনের প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। শিশিরও দিন দিন আহ্লাদে গোপালের ন্যায় আদুরে ও একগুঁয়ে হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মেজাজ যখন ভাল থাকিত না, চপলা সামান্য দোষেও পুত্রকে গুরুতর প্রহার করিত। বালক হইলেও তাহার যে পিতামাতা প্রভৃতি সকলের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা চপলা পুত্রকে কখনও বুঝাইতে চেষ্টা করিত না। শিশির মাতার নিকট সংযম-শিক্ষা আদৌ লাভ করে নাই। নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহার মাতা একবারে উদাসীন ছিল। শিবশঙ্কর বাবু মধ্যে মধ্যে কখনও শিশিরকে দু' একটা উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হইত না। ললিত ইচ্ছা থাকিলেও ভাইকে কিছু উপদেশ দিতে সাহস করিত না। একবার এক কথা বলায় চপলা ললিতকে দশ কথা শুনাইয়া দিয়াছিল এবং শিশিরকেও দাদার কোনও কথা কর্ণে তুলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। মায়ের হস্তেই শিশিরের শাসন-ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। চপলাও ছেলের পোষাক-পরিচ্ছদ ও সামান্য লেখাপড়ার দিকে নজর রাখিয়া ভাবিত তাহার কর্ত্তব্য সে ঠিক সম্পাদন করিতেছে। ভবিষ্যতে কুপ্রলোভনের আক্রমণ

হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার মত কোন শিক্ষাই শিশির পাইল না।

একদিন সন্ধ্যায় শিবশঙ্কর বাবু কলবাড়ী হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন, একজন জীর্ণবসনধারী স্ত্রীলোক ভিক্ষুকের বেশে তাঁহার সম্মুখীন হইল। তিনি তখন কোনও একটা কাজের বিষয় ভাবিতেছিলেন, তাহার প্রতি তেমন নজর করিলেন না; কিন্তু স্ত্রীলোকটি সেখানে থামিয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিল,—"বাবু!"

একি এ যে শ্যামা! তাহাকে চিনিতে পারিয়াই শিবশঙ্কর বাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সে একটা বাড়ীর দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কাঁপিতেছে। শিবশঙ্কর বাবু দয়া-বিগলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্যামা হয়েছে কি? এ রকম অবস্থা কি করে হলো?"

"আমি এখন নিরাশ্রয় ভিক্ষুক। এমন একটা পয়সা নেই যে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাই। তার ওপর আজ ক'দিন হলো পালা জ্বরে ভুগছি। তাই এখানে ফিরে এলাম। তোমা-দের বাড়ীতে মরতে পেলেও আমার বড় সুখ!"

"এখান থেকে চলে যাবার পর কোথা গেছলে?"

"নতুন গিন্নী তাড়িয়ে দেবার পর হাওড়ায় আমার ভায়ের কাছে যাই। তাদের অবস্থা দেখে প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়। ভাইকে দোকান করে দেবার জন্যেই তোমার কাছে আমার যে টাকা

গচ্ছিত ছিল, তা চেয়ে পাঠাই। দোকানও তাকে করে দিলাম, কিন্তু মদ খেয়ে আবার সব উড়িয়ে দিলে। চার বছর পরে দোকান তুলে দিয়ে তাদের যে অবস্থা সেই অবস্থাই দাঁড়ালো।" বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

সদাশয় শিবশঙ্কর বাবু তাহার দুঃখে বড় বিচলিত হইলেন। এ অবস্থায় ইহাকে ত্যাগ করিলে রোগে ও অনাহারে ইহার মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি শ্যামাকে তুলিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন; কিন্তু শ্যামা আর বাঁচিয়া উঠিল না। তাহার কথাই ফলিয়া গেল, সে যথার্থ মরিবার জন্যই তাহার বহু-পুরাতন মনিব-বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্যামার মৃত্যুর পর মিত্র-পরিবারে বর্ণনাযোগ্য কোনও ঘটনা গত চার বৎসরের মধ্যে আর ঘটে নাই। ললিতকুমার বি, এ, পাশ করিবার পরই, শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে নিজের কাজে বাহির করিলেন। ললিতের আরও পড়িবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পিতার উপদেশ অনুসারে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া সে পৈতৃক ব্যবসায় মন দিয়া শিক্ষা করিতে লাগিল। সততা ও নম্র ব্যবহারের গুণে সে অধীন কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীদের বশীভূত করিয়া ফেলিল। তাহার ভবিষ্যত যে অতীব উজ্জ্বল, শিবশঙ্কর বাবুর মনে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সুরমা শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে পদার্পণ করিতে উদ্যত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপে গুণে সে অন্নপূর্ণারই অবিকল অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। শিবশঙ্কর বাবু তাহার বিবাহের জন্য একটি সুপাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। শিশির স্কুলে পড়িতেছে, কিন্তু পড়াশুনার দিকে তাহার আদৌ মনোযোগ নাই। সে দিনরাত দুষ্ট সঙ্গীদের সহিত খেলিয়া ও পরের অপকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

একদিন বিকালে শিবশঙ্কর বাবু বাড়ী আসিয়া চপলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিশির বাড়ী এসেছে ?"

"না, এখনও তো তার স্কুল থেকে ফিরবার সময় হয় নি। এইবার এলো বলে।",

"সে আজ স্কুলে যায় নি। দুপুর বেলা রমা আমার কাছে তার নামে নালিশ করতে এসেছিলো। গোটাকতক ছেলের সঙ্গে তার ক্ষেতে গিয়ে ফসল সব নষ্ট করে দিয়ে এসেছে। সে বাধা দিতে তাকে গালাগালি পর্য্যন্ত করেছে। সে আমার খাতিরে তাকে কিছু বলতে পারে নে, আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করে গেল।"

চপলা রাগে চেঁচাইয়া উঠিল,—"এ সব মিথ্যে কথা! শিশির আমার তেমন ছেলেই নয়। অন্য ছেলেতে করেছে, সে ভাল মানুষ, দোষ পড়েছে তার ঘাড়ে। রমা বোধ হয় নেশা করেছিলো, তাই ছেলে ঠাওরাতে পারে নি।"

"তুমি যদি অমন করে এ সব কাজে ছেলেকে শাসন না করে উৎসাহ দাও, তাহলে তার মাথা একেবারে খেয়ে ফেলা হয়।"

এমন সময় শিশির ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহার পোষাক ধূলিধূসরিত, মুখের ভাব রুক্ষ। শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ স্কুল থেকে কখন বেরিয়েছ ?"

শিশির বুঝিল রমা পিতার নিকট সব কথা বলিয়া দিয়াছে। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"একটার সময়। আজ আমাদের টিফিনের সময় ছুটি হয়েছিলো।" পিতার নিকট

এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলিতে বালকের একটুও বাধিল না, এমনই তাহার শিক্ষার গুণ!

শিবশঙ্কর বাবু সে বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া, তাহাকে রমার অভিযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশির তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"বুড়ো সব মিথ্যে কথা বলেছে বাবা! আমি কোন দোষই করি নি।"

শিবশঙ্কর বাবু পুত্রকে ধমক দিয়া বলিলেন,—"গুরুজনের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়, তা তুমি এখনও শেখ নি। সত্যি কথা বল, আমি এর তদন্ত করবো। মুখ দিয়ে চুরুটের গন্ধ বেরুচ্ছে কেন?"

"কই না, আমি ত চুরুট খাই নি।" পরে সে কথা চাপা দিয়া শিশির বলিতে লাগিল,—"রমা যদি ফের আপনার কাছে আমার নামে এমন মিথ্যে কথা বলে যায়, আমি তাকে দেখে নেব; সে তাড়ি খেয়ে নেশার ঝোঁকে কি দেখতে কি দেখেছে!"

চপলা ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমি ত না শুনেই ঠিক বলেছি। আমার ছেলে কখনও এমন কাজ করতে পারে না।"

শিবশঙ্কর বাবু স্ত্রীর প্রতি ক্রোধপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি করতে রমার ক্ষেতের কাছে গেছলি?"

"আমরা তাড়াতাড়িতে সেটা পার হয়ে মাঠে বল খেলতে যাচ্ছিলাম। তার ফসল কিছু নষ্ট হয় নি।"

"ফসল নষ্ট হোক আর নাই হোক, অপরের ক্ষেতের উপর দিয়ে যাবারও তোমার কোন অধিকার নেই।"

"ও ক্ষেতটা ত আমাদের!"

"না, সে যতদিন ঐ ক্ষেতের জন্যে আমাদের খাজনা দেবে, ততদিন ও তারই। আমাদের ওতে কোনও অধিকার নেই। রমা অতি ভাল লোক, তোমরা নিশ্চয়ই তার ক্ষতি করেছ, নইলে সে কখনই তোমাদের নামে আমার কাছে নালিশ করতে আসতো না। আজ আর তোমাকে বেশী কিছু বল্লাম না; কিন্তু ফের যদি তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু নালিশ করতে আসে ত ভাল হবে না। আর যদি রোজ ঠিক স্কুলে না যাও, তোমার স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেব।"

শিবশঙ্কর বাবু হাত মুখ প্রক্ষালন করিতে চলিয়া গেলেন।

পিতা চলিয়া গেলে শিশির কাঁদিতে কাঁদিতে চপলাকে বলিল,—"মা, রমা সব মিছে কথা বলে গেছে, আমি কিছুই করি নি।"

চপলা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"তুমি কি আমার তেমন ছেলে বাবা! কর্ত্তার বয়সে ভীমরতি হয়েছে, তাই রমার কথা বিশ্বাস করেছে। কেঁদো না, চুপ কর বাবা। কাপড় চোপড়

ছাড়, খাবে চল। হিংসুকে লোকগুলো আমার ছেলের নামে যত মিছে কথা লাগায়!”

এ উক্তির মধ্যে ললিতের উপরও চপলার কটাক্ষপাত ছিল। শিশির রমার উপর এত চটিয়া গেল যে, সে প্রতিজ্ঞা করিল একবার বাগে পাইলে বুড়োর সে হাতে মাথা কাটিবে।

চপলার শিক্ষার ফল ঠিক ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আজ ললিতের মামার বাড়ীতে খুব ধূম-ধাম। কালীবাবুর বড় মেয়ের বিবাহ। জামাতা বিমলচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালীবাবুর আফিসেই এটর্নী পাশ দিবার জন্য আইন ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছিল। কালীবাবু তাহাকেই জামাতৃপদে বরণ করিয়া ভবিষ্যতে তাহাকে তাঁহার আফিসের অংশীদার করিতে স্থির করিয়াছেন। শিবশঙ্কর বাবু কাজের ভিড়ে কালীবাবুর কন্যার বিবাহোৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। চপলা ললিত, শিশির ও সুরমাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছে।

কালীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস ললিতের সমবয়স্ক। তাহারা দুইজনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সঙ্গে বি, এ, পড়িত। ললিত প্রথম বারেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার কাজে বাহির হয়। হরিদাস দু'বার চেষ্টা করিয়াও বি, এ, পাশ করিতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় এখন মধ্যে মধ্যে কালীবাবুর আফিসেই বাহির হইতেছে। তখন সুধীর নামে এক জমিদারপুত্র তাহাদের সহিত একসঙ্গে পড়িত। তাহার সহিত ইহাদের দুইজনের খুব আলাপ-পরিচয় হয়। পিতার মৃত্যুর পর সেই সুধীরচন্দ্র এখন পৈতৃক সম্পত্তির

অধিকারী হইয়াছে। তাহার পিতার স্বভাব-চরিত্র ভাল না থাকায় তিনি অধিকাংশ সম্পত্তিই বদখেয়ালি করিয়া উড়াইয়া গিয়াছিলেন। তবু যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই সুধীরের সংসার-যাত্রা খুব স্বচ্ছলে চলিয়া যাইত, কিন্তু সুধীরও বড়ই উড়োনচণ্ডী হইয়াছে। কলেজ ছাড়িবার পর ললিত আর সুধীরের বিশেষ কোনও সংবাদ রাখিত না। তবে যতদিন তাহারা একত্র ছিল, সুধীরকে সৎপথে রাখিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিত; তখন সুধীরও ললিতকে কেবল যে বন্ধুভাবে ভালবাসিত তাহা নহে, গুরুজ্ঞানে মধ্যে মধ্যে ভক্তিও করিত; কিন্তু হরিদাসের সহিত সুধীরের বন্ধুত্ব কলেজ ছাড়িয়া দু'জনে পৃথক হইবার পরও স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, কালীবাবুই সুধীরের পিতার এটর্নী ছিলেন। পুত্রও পিতার মৃত্যুর পর বিষয়-সংক্রান্ত কোনও গোলমালে পড়িলে তাঁহারই পরামর্শ লইত। সেই জন্যই সুধীরের সহিত হরিদাসের বন্ধুত্ব বরং ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

কালীবাবুর মেয়ের বিবাহে সুধীর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। হরিদাসের বন্ধু বলিয়া এ বাড়ীতে তাহাকে ততটা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইত না। সে একবার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া চকিতে সুরমাকে দেখিতে পাইল। সুধীর তখনও অবিবাহিত, সুরমাকে দেখিবামাত্র প্রথম দর্শনেই সে যথার্থ মুগ্ধ হইল। জমিদারের ছেলে, বড় ঘরের অনেক রূপসী কন্যা সে দেখিয়াছে,

কিন্তু এমন প্রশান্ত বদন, উন্নত ভাব সে আর কখনও কোনও বালিকাতে লক্ষ্য করে নাই। সে তখনই ভাবিল, ইহাকে বিবাহ করিতে পারিলে তাহার জীবন সুখময় হইতে পারে, নিজেকে অধঃপতন ও ধ্বংসের মুখ হইতে সে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিবে। পরে আবার যখন সংবাদ লইয়া জানিল যে সে ললিতের ভগিনী, সুধীর অনেকটা আশান্বিত হইল এবং সেই দিনই ললিতের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিল।

ললিত প্রথমটা সুধীরের কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। প্রথমতঃ তাহারা জমিদার, তাহাদের বাড়ী মেয়ের বিবাহ দিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যজীবনে সে সুধীরকে যেরূপ জানিত তাহাতে তাহার স্বভাব-চরিত্র তত ভাল ছিল না। এখন আবার পিতার মৃত্যুর পর নিজে জমিদারীর মালিক হইয়া সে নিশ্চয়ই আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ললিত সুধীরকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই, তুমি কিছু মনে করো না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই,—পূর্ব্বের দোষগুলো এখন শুধরেছে কি?"

সুধীর ললিতের হাত ধরিয়া উত্তর করিল,—"ভাই, নিজের স্বভাব চরিত্র সংশোধন করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি। তোমার বোনকে একবার দেখা অবধি আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মেছে যে, তাকে স্ত্রীরূপে পেলে, আমি নিশ্চয়ই আবার মানুষ হয়ে উঠবো।"

"ভাই, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার কারণ, যার তার হাতে আমরা সুরমাকে তুলে দিতে পারি না। সে রূপে গুণে লক্ষ্মীর সমান। পরে যদি অমানুষ স্বামীর হাতে পড়ে তার লাঞ্ছনা হয়, আমাদের অনুতাপের সীমা থাকবে না।"

"ভাই, সে বিষয়ে তোমাদের কোনও ভয় নেই। তুমি তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলো। তাকে সুখী করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

সেইদিন আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। চপলাও সুধীরের সহিত সুরমার বিবাহের কথা শুনিল। দু'এক দিন পরে ললিত সকলকে লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

বাড়ী আসিয়া ললিত পিতার নিকট সুরমার বিবাহের কথা তুলিল। শিবশঙ্কর বাবু সুধীরকে আদৌ চিনিতেন না, তবে কখনও দু'একবার ললিতের মুখে তাহার নামমাত্র শুনিয়াছিলেন। সে যে সর্ব্বাংশে সুরমার যোগ্য পাত্র কিনা, তাহা তিনি কিছুই জানেন না। তিনি ললিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজে পড়ার সময় সুধীরের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল। ললিত পিতাকে সব কথা খুলিয়া বলিল, তবে সুধীর একটু চেষ্টা করিলেই যে সে সব অভ্যাস সংশোধিত হইয়া যাইবে, বন্ধুর পক্ষ হইতে ইহাও সে পিতার নিকট বলিল এবং মামার বাড়ীতে

সুধীর নিজে ললিতকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না।

শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন,—"তাহলে দেখছি, ছেলেটি সুপুরুষ, অবস্থাও ভাল। আর এদিকেও সরল ও সত্যবাদী আছে, দেখছি। আমি তোমার মামাকে চিঠি লিখে তার চরিত্র সম্বন্ধে সংবাদ নেবো। অবশ্য বর বড় বটে, কিন্তু আমি সে দিকে লক্ষ্য করি নি, কিসে সুরমা স্বামীসুখে সুখী হয়, সে বিষয়ে আমাদের প্রথম মনোযোগ দিতে হবে।"

চপলা যখন শুনিল সুধীরের স্বভাব-চরিত্র তত ভাল নহে, আর এ বিবাহে বরপক্ষ নিজেই যখন উপযাচক, তখন বেশী অর্থ-খরচও হইবে না, সে মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে শিবশঙ্কর বাবুকে এ বিবাহে উৎসাহিত করিবার সময় বলিল,—"ছেলে বেলায় সকলেরই অমন একটু আধটু দোষ থাকে, তাতে কিছু এসে যায় না। বে হলেই তা শুধরে যাবে।"

শিবশঙ্কর বাবু কালীবাবুকে সব কথা খুলিয়া পত্র দিলেন। চপলাও লুকাইয়া দিদিকে পত্র দিল, এ বিবাহ যাহাতে হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে, কারণ খরচ-পত্র বেশী হইবে না। কালীবাবু যথাসময়ে পত্রের উত্তর দিলেন যে পাত্রের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জ্ঞাত নহেন, তবে হরিদাসের মুখে শুনিয়াছেন যে, সে বিষয়ে কোনও ভয়ের কারণ নাই। হরিদাস তাহাকে ভাল ভাবেই চেনে। তাহার পিতা মৃত্যুর সময়

অনেক দেনা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাকে বিষয়-সম্পত্তি কিছু বিক্রয় করিতে হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ছেলেটি দেখিতেও ভাল, সদ্‌বংশের সন্তান। তাঁহার মতে, আর বাড়ীর মেয়েদেরও মত তাই, তাহার হাতে সুরমাকে সমর্পণ করিতে শিবশঙ্কর বাবুর কোন আপত্তি না করাই উচিত।

কিন্তু সত্যপক্ষে সুধীর কি প্রকারে তাহার দৈনিক জীবন অতিবাহিত করিত? তাহার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোনও কাজ ছিল না। তাহার হাতে যদি কোনও কাজ থাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই এতটা অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া পড়িত না, সে ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়া উঠিত। নিজের মনের উপর তদ্রূপ জোর না থাকায় দুষ্টবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় সে অসৎপথে ধাবিত হইত, ইচ্ছা থাকিলেও সহজে ইন্দ্রিয় দমন বা লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না।

সমস্ত দিন গল্প-গুজব করিয়া ও ঘুমাইয়া সে কাটাইত। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই সে তাহার অপর এক জমিদার বন্ধু কিশোরী-মোহনের সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে গিয়া সমবেত হইত। সম-প্রকৃতির অপরাপর বন্ধু আসিয়া যথাসময়ে সেখানে জড় হইত। কখনও সকলে মিলিয়া রাতদুপুর পর্য্যন্ত তাস পাশা চালাইত, আর সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবীর আরাধনা করিত। সুধীর প্রথম প্রথম এই মদ্যপান হইতে বিরত থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিত, কিন্তু

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে বড় দুর্ব্বলচিত্ত ছিল, অসৎসঙ্গের সংসর্গে আসিয়া তাহার মধ্যে যেটুকু মনুষ্যত্ব ছিল তাহা দিন দিন পশুত্বে পরিণত হইতে লাগিল। কোনও দিন সকলে মিলিয়া রং চড়াইয়া থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে যাইত, কখনও বা বন্ধুর বাড়ী বাইজী আনাইয়া সারারাত্রি আমোদ-প্রমোদে যাপন করিয়া ভোরের বেলা অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ী ফিরিত। সে যে কি বীভৎস দৃশ্য, নারকীয় চিত্র, লেখনী তাহা বর্ণনা করিতেও সঙ্কুচিত হয়। সকলে মদ খাইয়া একেবারে সংজ্ঞাহীন,শেষে চাকর সহিসকে কোলে করিয়া বাবুদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে হইত।

সমস্ত রাত্রি আমোদে কাটাইয়া সুধীর ভোরে বাড়ী গিয়া ঘুমাইত। সেদিন তাহার বিছানা হইতে উঠিতে বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া যাইত ; এ অবস্থায় স্বভাবতঃই লোকে বড় খিট্‌খিটে হইয়া উঠে। সেও তখন বাড়ীর লোকজন ও চাকর-বাকরদের সহিত রুক্ষ ব্যবহার করিত। পরে শরীর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, অনুতাপানলে তাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকিত। সে কি প্রকারে এ পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে? এত অধঃপতন তাহার কি কারণে হইল? সে প্রতিজ্ঞা করিত, কিশোরীমোহনের আড্ডায় আর যাইবে না, তথাকথিত বন্ধুদের সহিত আর মিশিবে না ; কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তাহার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া আসিত, নেশাখোরের ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ সে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেথায় গিয়া উপস্থিত হইত। রোজই ভাবিত

আজই শেষ, কাল আর এদিকে সে পদক্ষেপও করিবে না, কিন্তু রোজই রজনী প্রভাত হইয়া দিন আসিতে যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার সে 'কাল' আর আসিয়া উপস্থিত হইল না।

সুধীর এই ভাবেই তাহার দৈনিক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিত। অথচ সে সম্বন্ধে ললিত তাহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেও সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল যে, সে এখন আর কোনও কু অভ্যাসের বশীভূত নহে। সুধীর হয় ত ভাবিয়াছিল এইবার সব প্রলোভনকে দূরে রাখিয়া সে নিজের স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করিবে, কিংবা তাহার বিবাহ হইয়া গেলে আপনা আপনিই এই সব দোষ সূর্য্যোদয়ে মেঘের ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সেই জন্যই রূপে গুণে অনুপমা সুরমাকে দেখিয়া সে একেবারে আত্মবিস্মৃত হয় এবং দুটো মিথ্যা কথা বলিয়াও যদি সে তাহাকে স্ত্রীরূপে পাইতে পারে, তাহা বলিতেও সঙ্কুচিত হইয়াছিল না। সুরমাকে একবার দেখিয়াই সুধীরের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে এই দেববালাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া দুর্গম সংসারপথে চলিলে, তাহার এক দৃষ্টিপাতেই হৃদয়ের সব পাপ-তাপ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

কিন্তু শেষ জীবনের পাথেয় ত তাহাকে যোগাড় করিতে হইবে? উত্তালতরঙ্গময় ভবনদী পার হইবার সে কি আয়োজন করিতেছে? সময় জলের স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিতেছে। অথচ

তাহার শক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইয়া আসিতেছে। তাহার ঈশ্বরদত্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, সরল পরদুঃখকাতর অন্তঃকরণের সে কি সদ্ব্যবহার করিতেছে? সে একবার ভুলিয়াও এই বিষয় গম্ভীরভাবে আলোচনা করে না যে, এই সব অন্যায়ের জন্য সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট একদিন তাহাকে জবাবদিহি দিতে হইবে!



নবম পরিচ্ছেদ

একখানি টম্‌টম্‌ অপরাহ্নবেলায় গঙ্গাতীরস্থ বড় রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিল। টম্‌টম্‌-চালককে দেখিলেই বেশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া ধারণা হয়; কিন্তু তাহার সুন্দর আকৃতিতে এমন একটা বিষণ্ণ ও রুক্ষভাব মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের চিহ্ন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। চালক উদাসীন ভাবে গাড়ী চালাইতেছিল। ইডেন-গার্ডেনের নিকট আসিবামাত্র সে হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল,—"এই যে কিশোরী!"

কিশোরীমোহন অদূরেই পথের উপর হাঁটিয়া উদ্যানের দিকে যাইতেছিল। তাহার নাম ধরিয়া কাহাকে ডাকিতে শুনিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল এবং বন্ধুকে গাড়ীর উপর দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

চালক চুপি চুপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, কিশোরী, পরশু রাতে তুমি ত বড়বাজারের আড্ডায় গেছলে?"

"হাঁ গেছলাম।"

"আচ্ছা সেদিন তুমি যতক্ষণ সেখানে ছিলে আমি কি বাজি খেলেছিলাম?"

"না, আমরা খেলছিলাম, তুমি সেদিন খুব মদ খেয়ে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলে। কেন, হয়েছে কি ?"

"রামশরণ বলে আমি খেলেছিলাম। দুএকজন সাক্ষীও আছে।"

"অনেক টাকা হেরেছ নাকি ?"

"তা মন্দ নয়। তুমি কখন চলে এলে ?"

কিশোরী একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"তখন রাত্রি প্রায় দুটো হবে। আমি ত দেখে এলাম তুমি বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছো।"

"তখন আর কে ছেলো ?"

"রামশরণ, তুমি আর হরিশ। আজ রাত্রে আমাদের ওখানে যাচ্ছো ত ?"

"একটু বিশেষ দরকারে যাচ্ছি। চেষ্টা করবো তোমাদের ওখানে যেতে।"

ভদ্রলোকটি টম্‌টম্ হাঁকাইয়া দিল। পরে হাইকোর্টের পাশেই এটর্নী কালীবাবুর আফিসের নিকট আসিয়া গাড়ী থামাইল। সহিসের হাতে লাগাম দিয়া ভদ্রলোকটি নামিয়া পড়িল এবং আফিসের ভিতর ঢুকিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কালীবাবু আছেন ?"

"আজ্ঞে না, বিমল বাবু আছেন। বসুন, তাঁকে খবর দিচ্ছি।"

জীবনের পথে

ভদ্রলোকটি ঘরের ভিতর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। আফিসের অনেকেই তাহাকে চিনিত। তাহার সুন্দর আকৃতি, তাহার অগাধ বিষয়-সম্পত্তি, তাহার সুখময় জীবনের কথা ভাবিয়া তাহাদের মনে যথার্থই হিংসার উদয় হইত। সে পায়ের উপর পা দিয়া বাড়ীতে বসিয়া কেমন সুখে দিন যাপন করিতেছে, আর তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিবার জন্য সারাদিন কত না হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়! কিন্তু তাহারা যদি মুহূর্ত্তের জন্যও এই ধনী জমিদারের অন্তঃকরণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত, তাহা হইলে লক্ষমুদ্রা পুরস্কারের লোভেও নিজেদের অবস্থার সহিত তাহার অবস্থার বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিত না। এমন সময় প্রধান কর্ম্মচারী বিমলবাবুর কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল,—"জমিদার সুধীরবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"তাঁকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এস।"

সুধীর ঘরের ভিতর ঢুকিতেই বিমল তাহাকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া চেয়ারে বসাইল। সুধীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কালীবাবু আজ আফিসে আসেন নি?"

"হাঁ এসেছিলেন, শিবশঙ্কর বাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন।"

"শিবশঙ্কর বাবু কি কলকাতায় এসেছেন নাকি?"

"হাঁ, গত রাত্রে এসেছেন। আপনার কিছু দরকার থাকলে আমাকে জানাতে পারেন।"

"আপনাকেও আমার দরকার জানাতে পারি। আমার কিছু টাকা চাই।"

"এবার টাকা সংগ্রহ করা বোধ হয় বড় শক্ত হবে। বাকি সম্পত্তিটুকু বাঁধা দিয়ে—"

"দেখুন, সে বিষয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি কিছুই জানি না। কালীবাবু সব জানেন; কিন্তু দশ দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা আমার চাই-ই।"

"কিন্তু সত্যি কথা বলি, এমন করে চালালে ত অল্পদিনের মধ্যেই অপনাকে দেউলে হতে হবে। আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আত্মীয় জ্ঞানেই এ কথাটা বল্লাম। শিবশঙ্কর বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে, আপনার সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা হবে ত! সেই ভেবেই এতটা বলতে সাহসী হয়েছি।"

সুধীর একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল,—"কি করি বলুন, খরচ যে অনেক চেষ্টা করেও কমাতে পারছি না। আমি ত আর পয়সাকে টাকা করতে পারি না! তবে এখন লক্ষীছাড়া হয়ে আছি, বের পর নিশ্চয়ই সব দোষ শুধরে যাবে। সে কথা আপনাকে জোর করে বলতে পারি।" সুধীরের ভয়ও হইয়াছিল পাছে তাহার বিরুদ্ধে ইনি শিবশঙ্কর বাবুর কাছে কিছু লাগাইয়া বিবাহের সম্বন্ধটা ভাঙ্গাইয়া দেন।

এমন সময় কর্ম্মচারী আসিয়া বিমলকে সংবাদ দিল, বাহিরে

একজন মক্কেল বসিয়া আছে, তাহার সহিত দেখা করিতে চায়। বিমল তাহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিল।

সুধীর উঠিয়া বলিল,—"না আপনাকে আর বেশী বিলম্ব করাবো না। কালীবাবুকে এ কথাটা বলতে ভুলবেন না। এ দশ হাজার পেলে আমি আর টাকার জন্যে আপনাদের বিরক্ত করবো না।"

বিমল জিজ্ঞাসা করিল,—"জিজ্ঞাসা করতে পারি এত টাকা কিসে খরচ হলো ?"

"বাজি খেলে।"

"বাজি খেলে এত টাকা হেরেছেন, বুঝতে পারলাম না।"

"আমার হুঁস ছিল না। পরশু রাতে হরিশ বলে আমার এক বন্ধু জোর করে আমাকে এক আড্ডায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে মদ খাইয়ে একেবারে অচৈতন্য করে ফেলে। তারপর যে কি হল আমার কিছু মনে নেই; পরদিন সকালে হরিশ আমার বাড়ী এসে বল্লে অত মদ খেয়ে কি বাজি খেলতে আছে, আমি নাকি খেলবার সময় হাতে তাসই ধরতে পারি নি! সে অনেক বারণ করেছিল, তার কথা কিছুতেই শুনি নি। রাত তিনটের সময় সে আমাকে জোর করে বাড়ী রেখে যায়। ব্যাপার শুনে ত আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম, ভাবলাম হরিশ বুঝি ঠাট্টা করছে; কিন্তু সে গম্ভীরভাবেই

বল্লে, দশ হাজার টাকা আমি কাল হেরেছি, আর সে টাকার জন্যে আমি হ্যাণ্ডনোটও লিখে দিয়েছি।"

"হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছেন বলে আপনার বিশ্বাস হয়? তারা ঠাট্টা করছে না ত?"

"প্রথম হরিশের কথায় আমি বিশ্বাস করি নি; কিন্তু রামশরণ বাবু যখন হ্যাণ্ডনোট দেখিয়ে টাকা চাইলেন, তখন আর অবিশ্বাস করবার কিছুই রইলো না। আমারই হাতের লেখা, লেখাটা একটু আঁকা বেঁকা বটে, কিন্তু আমারই হাতের।"

"কে রামশরণ? সে এখন জুয়ার আড্ডা খুলেছে, শুনেছি। তেমন লোকের সঙ্গে যত না মেশা যায় ততই ভাল।"

"হরিশের সঙ্গে আলাপ বলেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়। সেও ত একজন উকিল শুনেছি।"

"এক সময় উকিল ছিল বটে। পরে জাল জুয়োচুরি করায় তার নাম কেটে দিয়েছে।"

"সত্যি নাকি? তা হলে এ আড্ডার সঙ্গে তারও নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে। সে প্রায়ই সেখানে যায়।"

"তার কাছেই টাকা হেরেছেন নাকি?"

"সেই রকমই ত দেখছি। তাঁকেই হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছি, কিন্তু আমার এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও মনে নেই।"

"কিন্তু খেলে থাকলে, কতটাকা হেরেছেন তা মনে না

পড়লেও, খেলাটা নিশ্চয়ই মনে থাকতো ত! আর নিজের হাতে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে কেউ একেবারে সব ভুলে যেতে পারে না। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।"

"আমি আপনাকে সব সত্যি কথাই বলেছি, কিছুই গোপন করি নি। কেবল হরিশের সঙ্গে আড্ডায় গেছলাম, সেখানে গিয়ে কিশোরীমোহনের সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে একজন মদ খাইয়ে একেবারে অচৈতন্য করে ফেলে। তারপর কি ঘটেছে আমার কিছুই মনে নেই। পরদিন সকালে উঠে দেখি, নিজের ঘরে বিছানার উপর শুয়ে রয়েছি। মা পাশে বসে কাঁদছেন।"

"এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা!"

"তা বটে, কিন্তু সত্যি ঘটনা।"

"যখন খেলেছিলেন তখন সে ঘরে আর কে ছেল?"

"তা কি রকম করে বলবো। কিশোরীর সঙ্গে এই আমার দেখা হয়েছিল, সে রাত দুটোর সময় সেখান থেকে চলে আসে। তখন আমি ঘুমুচ্ছিলাম; হরিশ বলে দুটোর পর আমি উঠে খেলতে আরম্ভ করি। সে অনেক বারণ করেছিল, তার কথা শুনি নি। তখন খেলবার রোখ্ চেপেছিল।"

"হরিশ লোকটা কেমন?"

"মোটামুটি লোকটা মন্দ নয়। বড় অনুগত, যা বলি তা শুনে। একবার শিক্ষা হলো, আর কখনও ওদের সঙ্গে মিশছি

না। কালীবাবুকে বলবেন দশ দিনের মধ্যে টাকাটা যেন পাওয়া যায়। আমি ঐ সময় দেব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি। তা হলে আমি এখন আসি।”

সুধীর গাড়ীতে চড়িয়া নিজ বাড়ী অভিমুখে চলিল। শিবশঙ্কর বাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া সে আর সে রাত্রে কিশোরীমোহনের বাড়ী গেল না। যে কয়দিন তিনি কলিকাতায় থাকেন, সে খুব শান্তশিষ্ট হইয়া বাড়ী থাকিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল।

সুধীর চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই শিবশঙ্কর বাবু কালীবাবুর সঙ্গে আফিসে আসিয়া ঢুকিলেন। কালীবাবু আসিয়াই মক্কেল লইয়া একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিমল তখন শিবশঙ্কর বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। সে শিবশঙ্কর বাবুকে বলিল,—“সুধীর বাবু এই কিছু আগে এখান থেকে গেলেন; একটু দরকার ছিল, তাই এসেছিলেন।” বিমল আর তাঁহাকে দরকারটা ভাঙ্গিয়া বলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না।

“তাই নাকি? আজ সন্ধ্যায় তাদের বাড়ী কালীবাবুর সঙ্গে যাব স্থির করেছি। সুধীরকে তোমার কেমন লোক বলে মনে হয়?”

“মোটামুটি ভাল। তার মনটা খুব সরল। বড়লোক, সমান অবস্থার বন্ধুদের সঙ্গে মিশে টাকা পয়সার ততটা খেয়াল রাখতে পারে না। বে হলেই সে দোষ শুধরে যাবে বলে

আমার বিশ্বাস।" সুধীরের সহিত কথা কহিয়া তাহার সরল ব্যবহারে বিমল বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার মনে যথার্থই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বিবাহের পরই সুধীরের স্বভাব-চরিত্র নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সংশোধিত হইয়া যাইবে।

"কিন্তু তা না হলেই বড় ভয়ের কথা!"

"আমার যতদূর মনে হয়, সে ভয়ের কোন কারণ নেই; বিবাহের পর সঙ্গীদের সংসর্গ ত্যাগ করলেই সব শুধরে যাবে। তার অনেক গুণ আছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশ আছে, সে সবের সম্যক স্ফূর্ত্তি হলেই সুধীর সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারবে।"

"দেখ, আজকালকার যুবকেরা যেমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, আমারা কিন্তু তেমন ছিলাম না।"

"তখন আপনারা ছেলেবেলায় বাড়ীতে সৎশিক্ষা পেতেন, নানা প্রলোভনপূর্ণ সহরে এলেও সে সবের দিকে আকৃষ্ট হতেন না। এখনকার ছেলেরা বাড়ীতে কিছুই শিক্ষা পায় না, মারা ছেলেদের নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের দ্বারা বাড়ীর প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে না। তখন তারা স্বভাবতঃই আমোদের সন্ধানে বাড়ীর বাইরে যায়; সে সময় অসৎ সংসর্গে পড়লে, আর তাদের রক্ষা থাকে না। বিশেষ এ প্রকার যে সব যুবকের মাথার উপর দেখবার লোক নেই তাদের কথা ছেড়েই

দিন। বাড়ীতে সুশিক্ষারই অভাবে সুধীরেরও এরূপ অবস্থা হয়েছে। সেও আমাকে আজ এই কথা বলছিলো।”

“এ কথা অনেকটা সত্য বটে!” শিবশঙ্কর বাবু গম্ভীর-ভাবে উত্তর করিলেন।

বিমল আবেগভরে বলিতে লাগিল,—“আমার বিশ্বাস যুবকেরা যে অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হয়, বাড়ীতে শিক্ষার অভাবই তার প্রধান কারণ। ছেলের মারা তা বুঝেও বুঝেন না। তাঁরা অধিকাংশই অন্ধ স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে আদর দিয়ে ছেলেকে ভূত গড়ে তুলেন। সময়ে তার ঠিক কুফল ফলতে থাকে। যুবকেরা বাড়ীতে যদি নিজেদের লোকজনের মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদে দিন কাটাতে পায়, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের স্বভাব চরিত্র খারাপ হয় না।”

ইহা শুনিয়া শিবশঙ্কর বাবু শিশিরের ভবিষ্যৎ অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া মনে মনে বড়ই বিচলিত হইলেন। চপলাও ত পুত্রকে বাড়ীতে সুশিক্ষা দিবার কোনও চেষ্টা করে না। ইতি-মধ্যেই শিশিরের ব্যবহারে মধ্যে মধ্যে তিনি অভদ্রতা ও অবাধ্যতার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এমন সময় কালীবাবু কাজ শেষ করিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। শিবশঙ্কর বাবু কিছুক্ষণ পরে উঠিলেন, সহরে তাঁহার অন্য একটু দরকার ছিল। তিনি সন্ধ্যার সময় কালীবাবুর বাড়ীতে ঠিক হাজির হইবেন বলিয়া গেলেন। সেখান হইতে রাত্রে সুধীরকে দেখিতে

যাইবার কথা। চপলাও বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা করিবার জন্যই সুরমাকে লইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারা কালীবাবুর বাড়ীতেই আছে।

শিবশঙ্কর বাবু চলিয়া গেলে কালীবাবু বিমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যাবার পর হরিবাবু এখানে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে না; কিন্তু সুধীর বাবু কিছু পূর্ব্বে এসেছিলেন।"

"কি দরকার কিছু বলে গেছে?"

"সেই এক কথা—টাকা চাই।"

কালীবাবু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—"কি বাঁধা রেখে টাকা নেবেন? বিষয় সম্পত্তি সবই ত প্রায় বন্ধক রয়েছে।"

"তিনি দশ দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা চান।"

কালীবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করিলেন,—"কত টাকা?"

"আজ্ঞে দশ হাজার।"

কালীবাবু অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্যে এত টাকার দরকার?"

"খেলায় হেরেছেন।"

"ছোকরার কি এ নেশা জুটেছে? খালি টাকা, টাকা আর টাকা। টাকা হাতে পেলে আর জ্ঞান থাকবে না, ধূলোর মত

খরচ করবেন। নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই টেনে আনবে, আমরা আর কি করবো? কবের মধ্যে টাকা চাই?"

"দশ দিনের মধ্যে।"

"আচ্ছা, তার কি এতই মাথা খারাপ হয়ে গেছলো যে দশ হাজার টাকা খেলায় হারলে?"

"সুধীরবাবু বল্লেন, তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যান। সেখানে তাঁকে জোর করে মদ খাইয়ে অচৈতন্য করে ফেলে। সে অবস্থায় খেলে তিনি এত টাকা হেরেছেন, আর সেই টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছেন।"

"মদই হচ্ছে যত অনর্থের মূল! টাকা কার কাছে হেরেছেন?"

"রামশরণ বাবুর কাছে। হ্যাণ্ডনোট তাঁরই নামে।"

"কে, রামশরণ? তার মত বদমায়েস চালাক লোক পৃথিবীতে কটা আছে! সুধীর তার সঙ্গে মিশতে গেল কি বলে? হরিদাসটাও ত সেখানে যাচ্ছে না? তারও স্বভাব চরিত্রের উপর আমার আজকাল বড় সন্দেহ হয়েছে। তোমার শ্বাশুড়ী বোধ হয় লুকিয়ে তাকে টাকাকড়ি দেয়।"

"টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করতে না পারলে ছেলেকে ভাল করবার কোনও আশা নেই। সুধীর বাবুরও মা ঐ করেই ছেলেটির মাথা খেয়েছেন।"

"হাঁ দেখ, সুধীরের কি করবো ঠিক করতে পারছি

না। বের কথা ত প্রায় পাকাপাকি হয়ে দাঁড়াবার যোগাড়। শিবশঙ্কর আজ রাত্রে ছেলে দেখতে যাবে। সুধীরের মা কাল সকালে মেয়ে দেখতে আমাদের বাড়ী আসবেন। শিবশঙ্করকে এ কথাটা খুলে বলবো? তুমি কি এ সম্বন্ধে তাকে কিছু বলেছ?"

"না, এ টাকার সম্বন্ধে কোনও কথা তাঁকে আমি বলি নি। তবে সুধীর বড়লোক, সঙ্গদোষে পড়ে টাকা পয়সা খুব খরচ করে তা জানিয়েছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বের পর তার স্বভাব চরিত্র একেবারে বদলে যাবে। সে বিষয়ে আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"তবে আর শিবশঙ্করকে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা জানাবার দরকার নেই।"

রাত্রে কালীবাবু শিবশঙ্কর বাবু ও বিমলকে সঙ্গে লইয়া সুধীরের বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। শিবশঙ্কর বাবু কলিকাতা আসিয়াছেন শুনিয়া সুধীর পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিল। সে যথার্থই প্রথম দৃষ্টিতেই সুরমাকে ভালবাসিয়াছিল এবং তাহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, এখন সে যত মন্দই থাক, সুরমার ন্যায় রমণীরত্নকে বিবাহ করিবার পর সে নিশ্চয়ই সকল বিষয়ে সংযত হইবে। সেই জন্যই সুরমাকে বিবাহ করিবার জন্য সে এতটা লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে ৬'চারিটা মিথ্যাকথা বলিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। সে দিন কালীবাবুর আফিসে

বিমলের সহিত দেখা করিয়া আসিবার পর সোজাসুজি সে একেবারে বাড়ী চলিয়া আসে এবং কিশোরীমোহনের সাদর আহ্বান তুচ্ছ করিয়াও সন্ধ্যায় বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই।

সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা। বাড়ীর সম্মুখেই রমণীয় বাগান। বৈঠকখানা-ঘর মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত, তাহা হইতেই গৃহস্বামীর বনিয়াদী বংশের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। শিবশঙ্কর বাবু সুধীরের সুশ্রী আকৃতি ও ভদ্র আচার-ব্যবহারে বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ইহার যদিও এখন কোন দোষ থাকে, পরে নিশ্চয়ই তাহা সংশোধিত হইয়া যাইবে। তিনি বিবাহে নিজের পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়া আসিলেন। ইহাকেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! সুধীরের আনন্দের সীমা রহিল না। আসিবার সময় বিমল সুধীরকে এক ধারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল,—"কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। এখন ত আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হতে চল্লো! আপনার হয়ে আমি শিবশঙ্কর বাবুর কাছে অনেক ওকালতি করেছি; তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, বের পর আপনার স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হবে। আমাদের এ কথাটা যাতে সত্যি হয়, সে বিষয়ে আপনাকে আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

সুধীর গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—"আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না। আপনি আমার যে উপকার করলেন, আমি জীবনে তা কখনও ভুলতে পারবো না।

আপনার কাছে আজ প্রতিজ্ঞা করছি যে, ভগবানের আশী-র্ব্বাদে আপনাদের সে বিশ্বাস আমি নিশ্চয়ই কাজে পরিণত করবো। আপনি কিছু ভাববেন না।”

পরদিন সুধীরের মা কালীবাবুর বাড়ীতে আসিয়া সুরমাকে দেখিয়া বড়ই খুসী হইয়া গেলেন। এমন সুরূপা গুণবতী কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে কাহারও কোন অপছন্দ হইতে পারে না। বিবাহের কথা পাকা, এমন কি বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গেল। চপলা ও মনোরমা ইহার খারাপ দিকটা ভাবিয়াই মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইল এবং বাহ্যতঃও খুব হৃষ্টচিত্তে এ সম্বন্ধের অনুমোদন করিল।

সেদিন রাত্রে শিবশঙ্কর বাবু সুরমাকে পাশে ডাকিয়া বলিলেন,—“মা, যে যা বলে বলুক, কারও কথা শুনে মন খারাপ করো না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, এ বিবাহে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।” সুরমা কোনও উত্তর না দিয়া পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। দু’ একটা তপ্ত অশ্রুবিন্দু শিবশঙ্কর বাবুর পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল। শিবশঙ্কর বাবু কন্যার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পাশে আনিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

পরদিনই তাঁহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

শিবশঙ্কর বাবু ললিতকে বাড়ী আসিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গিয়াছে শুনিয়া ললিত বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সুধীরের সহিত সুরমার বিবাহে ললিতের প্রথম হইতেই সম্মতি ছিল, কৈশোরের বন্ধুকে আত্মীয়-রূপে পাইবে ভাবিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইল।

বিবাহের দিনকতক পূর্ব্বে ললিত ও সুরমা দু'জনে বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সুরমা বলিয়া উঠিল,—"দাদা, আমি গেলে তোমার বড় কষ্ট হবে!"

"তা হোগ্‌গে। মাঝে মাঝে তোর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তোকে দেখে আসবো। তখন তুই আবার খুব আদর যত্ন করবি ত, না তাড়িয়ে দিবি!"

সুরমা হাসিয়া উত্তর করিল,—"হাঁ, তাড়িয়ে দেব বৈ কি! তোমার বে হলে বৌ পেয়ে আমাকে না একেবারে ভুলে যাও! দাদা একটা কথা বলি, রাগ করো না, তুমি এবার বে কর। বাবা সে দিন বলছিলেন, তোমার কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু তুমি বে করতে রাজি নও। জান ত, বাবা কখনও তোমার অমতে বে দেবন না।"

"না বোন, বে এখন করবো না। একটা কাজ আছে,

সেটা শেষ না করে আমি বে করবো না। এই আমাদের কলের কর্ম্মচারীদের একটা ব্যবস্থা না করে, আমি স্থির হতে পারছি না। তাদের কষ্ট দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায়। অধিকাংশই যা রোজগার করে, তার অর্দ্ধেক মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়, তারপর তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। তাদের একটা উপায় করতে হবে।”

“দাদা, তুমি তাদের কি উপায় করবে? তারা নিজেদের দোষে নিজেরা কষ্ট ভোগ করছে, তুমি কি করবে?”

“না বোন, আমরা মনিব, তারা অধীন লোক, তাদের প্রতিও আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। তা না করলে আমাদের পাপ হবে। যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও। একটা কথা বলি, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবি, শ্বাশুড়ীকে খুব আদর যত্ন করবি। স্ত্রীলোকের স্বামীই পরম দেবতা। স্বামী যদি কিছু অন্যায়ও করে তাহলেও তাকে ঘৃণা করতে নেই। কোনও দোষ দেখলে রাগ না করে ভাল উপদেশ দিতে হয়। স্ত্রীলোক যদি সংসারে সুখ ও শান্তি আনতে না পারে, তাহলে পুরুষের আর বেঁচে সুখ হয় না। গুরুজনদের ভক্তি ও সেবা করবি, অধীন লোকদের মিষ্টি কথায় সন্তুষ্ট রাখবি। ভগবানের উপর যেন সর্ব্বদা বিশ্বাস থাকে। আর একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখবি, মানুষের জীবন ধারণ কেবল নিজের ছেলেপিলের লালন পালনে নয়, পরের জন্যেও যার প্রাণ কাঁদে সেই

যথার্থ মানুষ নামের যোগ্য। একদিনও যদি কারো এক ফোঁটা অশ্রুজল মুছাতে পারিস্, দুটো মিষ্টি কথাতেও যদি এক মুহূর্ত্ত কাকেও সন্তুষ্ট করতে পারিস্, তাতে মনে যেমন নির্ম্মল আনন্দ পাবি, এমন আর কোন কাজেই পাবি না। ভগবান সে লোকের উপর বড় সন্তুষ্ট থাকেন। আজ যদি আমাদের মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনিও তোকে আজ এই উপদেশই দিতেন।"

মায়ের কথা মনে পড়িতেই ভ্রাতা ভগিনী দুইজনেই বড় বিচলিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সুরমা বলিল,—"দাদা, তুমি যা বল্লে, সব মনে করে রাখবো।"

তারপর তাহারা দু'জনে বসিয়া অন্যান্য বিষয়ে কথা কহিতে লাগিল। সেদিন চপলার মেজাজটা বড় ভাল ছিল না। শিশির তাহাকে সমস্ত দিন বড়ই জ্বালাতন করিয়াছে। ভাই ভগিনীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপি চুপি কথা হইতেছে শুনিয়া তাহার সন্দেহ হইল, বোধ হয় তাহার বিরুদ্ধেই কোন কথা হইতেছে। চপলা তাহাদের নিকট গিয়া রাগান্বিতভাবে বলিল,—"এত রাত্রি পর্য্যন্ত সব বসে কি হচ্ছে? যাও, খেয়ে দেয়ে শোও গে।"

ললিত উত্তর করিল,—"না, আমরা একটু পরে খাবো। দুজনে বসে একটু গল্প করছি। সুরমা শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে ত আর তার সঙ্গে গল্প করতে পাব না।"

ললিতের এ উত্তর চপলার মনোমত হইল না। সে আরও রাগিয়া গেল। এমন সময় শিবশঙ্কর বাবু সেই ঘরের ভিতর

প্রবেশ করিলেন। চপলা রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে বলিল,— "তোমার ছেলেমেয়ে আমার মুখে মুখে চোপরা করবে, কোনও কথা শুনবে না। তুমি ত তাদের কিছু বলবে না!"

শিবশঙ্কর বাবু বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই পত্নীর মুখে এ অভিযোগ শুনিয়া তাহার উপর বড় বিরক্ত হইলেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করিলেও, তিনি একদিনের জন্যও নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে পুত্রকন্যাকে কোনওরূপ তিরস্কার করেন নাই। তিনি চপলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, কি হয়েছে?"

"আমার মাথাটা আজ বড় ঘুরছে, এত রাত পর্য্যন্ত দুজনে বসে গল্প হচ্ছে, তাই বল্লাম খেয়ে নিয়ে শোও গে। ললিত উত্তর দিল, না, এখন ওরা শোবে না, জেগে বসে গল্প করবে।"

"তা বেশ ত, দুজনে বসে গল্প করছে, তাতে দোষ কি? খাবার এত তাড়া কেন, কিছু পরেই খাবে এখন। তোমার জেগে থাকবার দরকার নেই। শরীর অসুস্থ হয়ে থাকে, তুমি শুয়ে পড়গে। ওরা যখন ইচ্ছে খাবে এখন।"

চপলা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল,—"ছেলেরা আমার বাড়ীতে বসে আমারই অপমান করবে, আর তুমি কিছু বলবে না?"

শিবশঙ্কর বাবু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"না, তোমাকে অপমান করবে এত বড় সাহস ওদের কেন হবে? আর তুমিই বল না, আজ পর্য্যন্ত একদিনও কি ওরা তোমাকে

অপমান করেছে? আর বাড়ী তোমারও যেমন, ওদেরও তেমনই। এতে সবারই সমান অধিকার।"

"আমি ত জানি, তুমি ছেলেমেয়েকে কিছু বলবে না। এই করেই ওদের মাথা খাচ্ছ! আমার পোড়া কপাল, তাই ওদের দোষ দেখলে কথা না কয়ে থাকতে পারি নি।" এই বলিয়া রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে চপলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিবশঙ্কর বাবু কিছুক্ষণ তাহাদের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন। পরে পোষাকাদি ছাড়িবার জন্য উঠিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"বেশী রাত করো না, অসুখ করবে।"

* * * * *

বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধীর যথাসময়ে বরবেশে সজ্জিত হইয়া জাঁক-জমকের সহিত শিবশঙ্কর বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া সকলেই বরের প্রশংসা করিতে লাগিল। কেবল চপলা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"রূপ হলে হবে কি? এখন শুনতে পাচ্ছি, জামায়ের স্বভাব চরিত্র নাকি খুব খারাপ!" এ কথা সুরমারও কানে গেল। সে নির্জ্জনে বসিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিল,—"ভগবান, স্বামীর চরণ সেবার যেন যোগ্য হই!"

শিবশঙ্কর বাবু মেয়ের বিবাহে খুব ঘটা করিয়া লোকজন খাওয়াইলেন। বন্ধু-বান্ধবে তাঁহার প্রশস্ত অট্টালিকা পূর্ণ হইয়া

গিয়াছিল। তিনি ও ললিত সকলকে যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করিয়া তুষ্ট করিলেন। শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। শিবশঙ্কর বাবু নিজেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের আন্দোৎসবের মধ্যেও আজ একজনের উপস্থিতির অভাব ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িতেছিলেন। ললিতও মাতার কথা স্মরণ করিয়া কতবার যে বস্ত্রপ্রান্তে অশ্রুজল মুছিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ভৃত্য হরি সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া রাত্রে বাসরঘরে জামাইবাবুর পাশে দিদিমণিকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই "আহা আজ যদি গিন্নীমা বেঁচে থাকতো!" বলিয়াই বেচারী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কেবল চপলার এ সব দৃশ্য আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। সে যতটা সম্ভব নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, যেন এ উৎসবে সে নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র! তাহাও উৎসবের আনন্দের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য নহে, পরশ্রীকাতর আত্মীয়ের ন্যায় গাত্রদাহনে জ্বলিবার জন্যই সে মুখে হাসি ও অন্তরে বিষ লইয়া আসিয়াছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে। কালীবাবু দিনকতকের জন্য দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে বিমলই আফিসের কাজ-কর্ম্ম চালাইতেছে।

একদিন বিমল আফিসে বসিয়া নিজের কাজ করিতেছে, এমন সময় একজন কর্ম্মচারী ঘরের ভিতর ঢুকিল। বিমল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"রামবাবুর 'সিল'টা হলো ?"

"আজ্ঞে না, 'সিল' আর করতে হয় নে। সব টাকা দিয়ে দিয়েছে।"

"বল কি ? একেবারে সব টাকা !" বিমল বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল।

"আজ্ঞে হাঁ, খরচ ও সব ঠিক ধরে নিয়েছি।"

বিমল উঠিয়া নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কর্ম্মচারীও তাহার অনুসরণ করিল। পরে পকেট হইতে পাঁচশো টাকার একখানি নোট ও দশটি নগদ টাকা বাহির করিয়া বিমলের হাতে দিল। বিমল জিজ্ঞাসা করিল,—"হরিবাবুর হাতে যদি টাকাই ছেল, কেন মিছিমিছি আমাদের এতটা কষ্ট দিলে ?"

"আজ্ঞে, হরিবাবুর হাতে টাকা ছিল না। তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে এই নোটখানা এনে দিলেন। পেয়াদা বাড়ীর

ভেতর ঢুকতেই তিনি হরিবাবুকে একধারে ডেকে কি বল্লেন, পরে ঘরের ভেতর ঢুকে এই নোটখানা তাঁর হাতে দিলেন।"

"আশ্চর্য্য! হরিবাবু বুঝি জানতেন না তাঁর স্ত্রীর কাছে টাকা আছে? জানতে পারলে এতদিনে তাও নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিতেন।"

"না হরিবাবু জানতেন না। স্ত্রীকে পাঁচশো টাকার নোট বার করতে দেখে তিনিও খুব বিস্মিত হয়ে গেছলেন। তিনি স্ত্রীকে বল্লেন, নিশ্চয়ই তোর কাছে আরও টাকা আছে, বার করে নিয়ে আয়। তিনি তখন কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, আর এক আধলাও তাঁর কাছে নেই। তাঁর কান্না দেখে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছিল।"

কর্ম্মচারী চলিয়া গেল। হরিবাবুর স্ত্রীর অবস্থা শুনিয়া বিমলের মনেও যথার্থই বড় দুঃখ হইয়াছিল। সে মনে মনে বলিল,—"আমি যদি এ আফিসের কর্ত্তা হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই এমন করে টাকা আদায়ের আদেশ দিতাম না। শ্বশুর মশাই কাজ করে করে তাঁর মনটাও একেবারে পাষাণের মত কঠিন হয়ে গেছে, দেখছি! এ কি?"

নোটের পশ্চাদ্ভাগে একজন লোকের নাম দস্তখত দেখিয়া বিমলের মনে হইল এ নোট সেই একদিন কাহাকে দিয়াছিল। সে সময়ও এই লম্বা লম্বা বড় বড় অক্ষরে দস্তখত তাহার নজরে পড়িয়াছিল। সে একটু ভাবিতেই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে,

রামশরণ বাবুর ধার শুধিবার জন্য সুধীরকে দশ হাজার টাকা দিবার সময় অন্যান্য নোটের সহিত সে এই নোটও দিয়াছিল। তখনই সে নোটের নম্বর মিলাইয়া দেখিল, নম্বর ঠিক মিলিয়া গেল। সুধীর যে নেশার ঝোঁকে বাজি খেলিয়া দশ হাজার টাকা হারিয়া গিয়া হাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছিল, এ অদ্ভুত ঘটনা বিমল আজও কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সে ভাবিল, দেখি যদি এইবার চেষ্টা করিলে আসল ঘটনা কিছু বাহির হইয়া পড়ে।

বিমল চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। হরিবাবুকে সে আদৌ চিনিত না। তাহাদের এক মক্কেলের ডিক্রি জারি করিতে গিয়া তাহার নাম মাত্র সে শুনিয়াছিল। তবে কি এ লোকটাও রামশরণ বাবুর আড্ডার একজন চেলা? আচ্ছা, রামশরণ বাবু সুধীরের নিকট দশ হাজার টাকা পাইয়া তাহার মধ্যে পাঁচশো টাকাই বা কেন হরিবাবুকে দিতে যাইবেন? এটা যেন ঘুষ বলিয়াই মনে হইতেছে!

বিমল বেয়ারাকে ডাকিল। বেয়ারা আসিলে সে মদনবাবুকে তাহার নিকট ডাকিয়া দিতে বলিল। যে কর্ম্মচারী ডিক্রির টাকা লইয়া আসিয়াছিল, তাহারই নাম মদন। মদন ঘরের ভিতর ঢুকিলে বিমল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মদনবাবু, আপনি এই হরিদাস ঘোষকে চেনেন? লোকটা কি কাজ করে জানেন?"

"আজ্ঞে না, তাকে চিনি না। তবে রামবাবুর মুখেই শুনেছি লোকটা ভদ্রবংশের সন্তান, এক সময় ওর অবস্থাও খুব ভাল ছিল। মদ খেয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করেছে। এখন বড় লোকদের মোসাহেবী করে আর ঘুরে বেড়ায়।"

বিমল এরূপ উত্তরই আশা করিয়াছিল। সে বলিল,—"এই হরিবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। তাঁকে একবার এখানে ডেকে আনতে পারেন?"

"আজ্ঞে, চেষ্টা করলে বোধ হয় ডেকে আনতে পারি।"

"একবার চেষ্টা করে দেখুন দেখি।"

মদন হরিদাসের সন্ধানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল, পরে তাহাকে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া আফিসে সঙ্গে করিয়া আনিল। লোকটা দেখিতে রোগা, তাহার পরণে মলিন পোষাক, মুখের ভাব বিমর্ষ, গাল চড়াইয়া গিয়াছে; তবু তাহাকে দেখিলে ভদ্রবংশের সন্তান বলিয়া এখনও একটু বুঝিতে পারা যায়। বিমল তাহাকে চেয়ারে বসিতে বলিয়া নোটখানি বাহির করিল।

বিমল আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"আপনার বাড়ীতে আজ 'সিল' বসাবার জন্যে পেয়াদা গেছলো। আপনি এই নোট দিয়ে ডিক্রির টাকা শুধে দিয়েছেন। এই নোট সম্বন্ধেই আপনাকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

হরিদাসের মুখ মৃত ব্যক্তির ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আমতা আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নোটটা কি গোলমেলে, মশাই? আপনার কি জাল বলে মনে হচ্ছে?"

"এ নোট আপনি পেলেন কোথা?"

"নোটটা যদি জাল হয়, আমি কিছুই জানি নি মশাই।"

"সে যাই হোক্, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, এই নোট আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন সে কথা যদি ঠিক বলেন, তাহলে আপনার বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই। আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।"

"অনেক দিন আগে এটা আমার হস্তগত হয়।"

"আন্দাজ কতদিন আগে হবে? তারিখটা মনে আছে?"

"মুখে ঠিক বলতে পারি না। তবে আমার নোটবই দেখলে বলে দিতে পারি। আন্দাজ বছরখানেক হবে।"

"কি রকমে এটা আপনার হস্তগত হলো?"

"পাঁচশো টাকার দুখানা নোট আমি পাই। আর এক-খানা ত আসলই ছেল মশাই। ব্যাঙ্ক থেকে আমি ভাঙ্গিয়ে এনেছিলাম।"

"কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, বলুন না?"

"একজনের কাছে আমি হাজার টাকা পেতাম। সে এই দুখানা নোট দিয়ে আমার টাকা শোধ দেয়।"

"হরিদাস বাবু, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন না।

আপনি যদি সত্যি কথা বলেন, আপনার কোনও ভয় নেই। তা না হলেই কিন্তু গোলে পড়তে হবে।"

"আমি রামশরণ বাবুর কাছ থেকে পাই। উকিল রামশরণ বাবু! তাঁর কাছে আমার হাজার টাকা পাওনা ছিল, তিনি তুখানি পাঁচশো টাকার নোট দেন। একখানা নোট আমি নিজেই খরচ করি, আর একখানা আমার স্ত্রীকে দিই। তার নোটখানি সে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। সময় সময় আমাদের যখন খুব টাকার অভাব হয়েছে, আমি তাকে কতবার বলেছি ওখানা ভাঙ্গাবার জন্যে। দেনা শুধতে, সংসার খরচ জোগাতে জোগাতে নোট ভাঙ্গিয়ে সব খরচ হয়ে গেছে বলে এতদিন সে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। আজ পেয়াদা ঘরে ঢুকে জিনিষ পত্র ক্রোক করতেই নোটখানি কাঁদতে কাঁদতে বার করে দিলে। মেয়ের বের জন্যে এ টাকা সে গছে রেখেছেলো।"

রহস্য ক্রমেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে ভাবিয়া বিমল মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইল, কিন্তু বাহিরে বেশ শান্তভাবেই হরিদাসকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"রামশরণ বাবু কি আপনার কাছে বাজি খেলে টাকা হেরেছিলেন?"

"আজ্ঞে, ও কথা বলবেন না, রামশরণ বাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমি তাঁর আড্ডার একজন নগণ্য কর্ম্মচারী মাত্র!

আমার সঙ্গে তিনি কি বাজি খেলতে পারেন? তাঁর মানের লাঘব হবে যে!"

"যাই হোক, এ টাকাটা বাজি খেলারই টাকা। আপনি রামশরণ বাবুর সঙ্গে না খেলতে পারেন, রামশরণ বাবু ও অপরের মধ্যে খেলা হয়েছিল।" বিমল ধীরভাবে এই কথাগুলি বলিল।

হরিদাস চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিমল বলিতে লাগিল,—"আর সেই খেলায় দশ হাজার টাকা রামশরণ বাবুর লাভ হয়েছিল, কেমন?"

হরিদাস উত্তর করিতে পারিল না। সে কেবল হাঁ করিয়া বিমলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"মশাই, আপনি কি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

বিমল দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল,—"আমি প্রায় সবই জানি। যেটুকু জানি না, আপনার কাছে জানতে চাই। সুধীর বাবুকে মদ খাইয়ে অচৈতন্য করে এই দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট জোর করে তাঁর কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সত্যি নয় কি?"

হরিদাস নিরুত্তর।

"সেখানে তখন আপনি, রামশরণ বাবু ও হরিশ বাবু ছিলেন। আর কে কে ছিল?"

হরিদাস ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আপনার কথার জবাব দিতে আমার আর কোনও আপত্তি নেই, কেবল রামশরণ বাবু যদি জানতে পারেন আমি সে কথা বলেছি, তাহলে আমার আর রক্ষে থাকবে না।"

"সে কথা কেউ জানবে না। এ প্রসঙ্গে আমি কারও কাছে আপনার নাম উল্লেখ করবো না। রামশরণ বাবু কিছুই টের পাবেন না। এ কেলেঙ্কারি নিয়ে বোধ হয় আমরা আর বেশী বাড়াবাড়ি করবো না। হরিশবাবুর সঙ্গে সুধীরবাবু ত রামশরণ বাবুর আড্ডায় গেলেন। তার কিছু পরেই তাঁকে রামশরণ বাবু জোর করে মদ খাইয়ে দিলেন। তিনি মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন। সে অবস্থায় তিনি বাজি খেল্‌লেন কি রকম করে? কিশোরীমোহন বাবুও সেখানে ছেলেন ত?"

"রাত দুটোর সময় কিশোরীমোহন বাবু ও অপরাপর দু একজন চলে যান। তখন ঘরে সুধীরবাবু ও হরিশবাবু ছাড়া আর কেউ ছিল না।"

"আর রামশরণ বাবু?"

"হাঁ তিনি ত ছেলেনই! তিনিই ত আড্ডার কর্ত্তা। এ ছাড়া ঘরের ভেতর আর কেউ ছিল না। আমি বাইরের বারান্দায় বসেছিলাম, বাবুরা না গেলে আমি ত যেতে পারি না। রামশরণ বাবু হরিশবাবুর সঙ্গে চুপি চুপি কি যুক্তি করে সুধীর

বাবুর কাছে এলেন ; পরে দুজনে তাকে ধরাধরি করে তুলে টেবিলের পাশে চেয়ারে এনে বসালে। সুধীরবাবুর তখন একটুও হুঁস ছিল না। হরিশবাবু তাঁর হাতে তাস দিতে লাগলেন কিন্তু তাসগুলো সব হাত থেকে পড়ে যেতে লাগলো, সুধীরবাবু ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর মাথা বুকের উপর নুয়ে পড়লো। 'না, এ সুবিধা হবে না, অত অক্ষর লিখতে পারবে না, আর একটা উপায় করা যাক্।' এই বলে রামশরণ বাবু তাঁর পকেট থেকে একখানা একশো টাকার হ্যাণ্ডনোট বার করে হরিশবাবুকে বল্লেন,—'এটা সুধীরবাবু আর একদিন আমাকে লিখে দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়িতে অক্ষরে একশো টাকা লিখতে ভুলে গেছলেন, এটাতেই আর দুটো শূন্যি বসিয়ে নেওয়া যাক, কোনও হাঙ্গাম থাকবে না।' তারপর তারা সুধীরবাবুর মুখের ভেতর আরও খানিকটা মদ ঢেলে দিল। সেটা গলার ভেতর না গিয়ে তাঁর বুকের জামার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।"

"আপনি বারান্দাতে বসে সব দেখতে লাগলেন? তারপর কি হলো?"

"তাঁরা সুধীরবাবুকে বিছানায় আবার শুইয়ে দিলেন। রামশরণ বাবু একশো টাকার হ্যাণ্ডনোটখানা হাতে ধরে বল্লেন, —'এতে তারিখ আছে পয়লা, আজ মাসের এগার তারিখ, বেশ সুবিধাই আছে, পাশে একটা এক বসিয়ে দিলেই হবে।' হরিশবাবু উত্তর করিলেন,—'সবই ত ঠিক হলো। তবে সুধীর যদি টের

পায়, তার একশো টাকার হ্যাণ্ডনোটকে বদলে দশ হাজার করা হয়েছে ?' রামশরণ বাবু উত্তর করলেন,—'না, সে ভয় নেই। সে কিছুতেই তা টের পাবে না, আর এ হ্যাণ্ডনোটের টাকা তার কাছে আমি এখনও একবারও তাগাদা করি নি, সে বোধ হয় এর কথা একেবারে ভুলে গেছে। সেদিনও মদ খাইয়ে তবে তাকে খেলতে বসাই। মদ না খেলে সে কিছুতেই খেলতে চায় না। সেদিন খেলেছিল বটে, কিন্তু তেমন হুঁস ছিল না, তাই অক্ষরে একশো টাকা লিখতে ভুলে গেছলো।"

"এই রকমেই একশো টাকার হ্যাণ্ডনোট দশ হাজারে পরিণত হলো!" বিমল বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল। "লোকটা পাকা জোচ্চোর ত! আপনি এ টাকার ভাগ পেলেন কেমন করে ?"

"কাজ শেষ করে রামশরণ বাবু বাইরে এসে দেখেন আমি বারান্দায় বসে আছি। আমার কথা তাঁর একেবারেই মনে ছিল না। আমাকে দেখেই তিনি একেবারে শিউরে উঠলেন। উদ্বিগ্নভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'হরিদাস, তোমার মেয়ের বের কতদূর কি হলো ?' আমি বল্লাম,—'মশাই, সম্বন্ধ ত আসছে, কিন্তু এদিকে যে টাকার জোগাড় নেই!' তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন, 'আচ্ছা আমি কিছু সাহায্য করবো।' আমি বুঝতে পারলাম আমার উপর এতটা সদয় ব্যবহারের কারণ কি। আমি তখন হরিশবাবুর সঙ্গে সুধীরবাবুকে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে

দিয়ে এলাম। দিন দশ বার পরে একদিন রামশরণ বাবু আমাকে এক ধারে ডেকে বল্লেন,—'হরিদাস এই হাজার টাকা রেখে দাও, তোমার মেয়ের বেতে খরচ করো।' অবশ্য এর আসল মানে আমার আর কিছুই বুঝতে বাকি রইলো না।"

"আপনি টাকাটা ঘুষ জেনেও গ্রহণ করলেন?"

"আর কি করি, মানুষ যখন হীন অবস্থায় পড়ে, তখন হাতে কেউ টাকা গুঁজে দিলে ভাল মন্দ বিচারের আর প্রবৃত্তি হয় না। আমার যদি টাকার এত অভাব না হতো, তাহলে ব্যাপার প্রথমই যখন টের পেয়েছিলাম, তখনই রামশরণ বাবুকে এ কাজে বাধা দিতাম। এই আড্ডায় কত বীভৎস কাণ্ড ঘটছে তা শুনলে আপনার ন্যায় ভদ্রলোকের সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠবে। আমিও রামশরণ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি, কাজকর্ম্ম দেখি, মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাই। আর এ টাকাটা আমি না নিলেও সুধীরবাবুর কিছু লাভ হতো না ত! সময় সময় এ সবের জন্যে আমার বড়ই আত্মগ্লানি হয়। কিন্তু কি করি এই এখন আমার জীবিকা উপার্জ্জনের একমাত্র উপায়!"

"আপনি পূর্ব্বে কি করতেন জিজ্ঞাসা করতে পারি? আপনার অবস্থাই বা এত হীন হলো কি রকমে?"

"আমি দেশের স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে আসি। আমি মেসে থাকতাম। বাবা নিয়ম মত ঠিক আমাকে মাসে মাসে খরচ পাঠাতেন; কিন্তু অসৎ সংসর্গে পড়ে

আমার এই অবনতি হয়। আমার ডাক্তারি আর পাশ করা হলো না। বাবা সব জানতে পেরে আমার খরচ বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন চাকরি করতে ঢুকলাম। বাপ মার মনে যে কত কষ্ট দিয়েছি তার সীমা নেই, সেই সবের ফলই আজ আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে।"

"আপনার বয়স বোধ হয় চল্লিশের বেশী হবে না। আপনি চেষ্টা করলে এখনো ত স্বভাব চরিত্র শুধরাতে পারেন?"

"তা আর হবার নয়! পূর্ব্বে দু একবার চেষ্টা করেছিলাম, সফল হই নি। এক মদের নেশাই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমি যে সব কাজ করি, মদ না খেলে কিছুতেই তা করতে পারতাম না। ভদ্রঘরের সন্তান, লেখাপড়া শিখে এতই নীচ হয়ে পড়েছি যে, অনায়াসে এই পাপ ব্যবসা অবলম্বন করে জীবিকা উপার্জ্জন করছি; মশাই আমার আর কোনও আশা নেই, ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তাহলে এখন যেতে পারি?"

"আচ্ছা, আমি দেখবো, আপনার মেয়ের বের জন্যে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি কি না।"

হরিদাস উঠিল। তাহার সজল চক্ষুর্দ্বয় বিমলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বিমল ভাবিল, হায়, এই লোকটার যদি মনের জোর ও সংযম থাকিত, তাহা হইলে আজ তাহাকে নিশ্চয়ই এরূপ হীন অবস্থায় পরিণত হইতে হইত

না! সে সকলের প্রিয়পাত্র ও সমাজের একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিতে পারিত। হরিদাস মাথা হেঁট করিয়া সলজ্জ পদবিক্ষেপে আফিস পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা বিমল সুধীরদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সুধীরের এক পীসি নিঃসন্তান অবস্থায় মরিবার সময় সুধীরকেই তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও নগদ টাকা সবই দিয়া গিয়াছিলেন। সুরমার পরামর্শ অনুযায়ী সুধীর সেই টাকায় কোনও ব্যবসায় চালাইতে মনস্থ করিয়াছে। বিবাহের পর হইতেই সুরমার সংস্পর্শে আসিয়া সুধীরের স্বভাব-চরিত্র অনেকটা সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। একটু আধটু সংশোধনের যাহা বাকি ছিল, তাহা যে অচিরেই সংশোধিত হইবে, সে বিষয়ে সুরমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুধীরের বৃদ্ধ মাতার কাল হওয়ায় সুরমাই এখন বাড়ীর গিন্নী হইয়াছে।

বিমল সুধীরের বাড়ী গিয়া দেখিল, সুধীর তাহার বন্ধু কিশোরীমোহনের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছে। কিশোরীমোহনের সঙ্গে বেশী মেলামিশা করা সুরমা আদৌ পছন্দ করিত না। তবে আজ সুধীর যখন তাহাকে বলিল, এ নিমন্ত্রণে না গেলে কিশোরী বড়ই দুঃখিত হইবে, সুরমা আর কোনও আপত্তি করিল না। ভাবিল বেশী বাঁধাবাঁধি করিতে গেলে সবই না ফসকাইয়া যায়! তবে তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল বাড়ী ফিরিতে যেন অধিক রাত্রি না হয়।

বিমল সুধীরকে বাহিরে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল,—"ভাই, একটা দরকারি কথা আছে। তুমি যে রামশরণ বাবুর কাছে দশ হাজার টাকা বাজি খেলে হেরেছ, এ সর্ব্বৈব মিথ্যা!"

সুধীর বিস্ময়ে বিমলের হাত ধরিয়া বলিল,—"কি বল, টাকা হারি নি?"

"না, আমি ভেতরের খবর সব পেয়েছি। তবে কার কাছ থেকে জেনেছি, সে নামটা তোমাকে বলবো না। হরিশ ও রামশরণ দুজনে যুক্তি করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে!"

এই বলিয়া বিমল আদ্যন্ত তাহার নিকট সব ঘটনা বর্ণনা করিল। সুধীর উত্তেজিতভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিল। বিমল চুপ করিলে সুধীর বলিয়া উঠিল,—"বড়ই দুঃখ হচ্ছে যে, এ কেলেঙ্কারি আদালতে গড়ান যুক্তিসঙ্গত নয়!"

বিমল উত্তর করিল,—"না, সে কাজ করে আর দরকার নেই। তবে হরিশ ও রামশরণের সঙ্গে আর কথা পর্য্যন্ত কয়ো না, তাই সাবধান করে দিতে এলাম। সেদিন যে হরিশ আবার এখানে এসেছিল!"

"হাঁ, আমাকে রামশরণের ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক লোভ দেখিয়েছিল, কিন্তু আমি তার কথায় ভুলি নি। ওদের আর এ মুখো হতে দেব না।"

বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা করিয়াছিল। আর অধিক বিলম্ব না করিয়া সুধীর বিমলের নিকট বিদায় লইয়া বন্ধুর বাড়ী চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কিশোরীমোহনের বাড়ী সেদিন প্রীতিভোজের প্রচুর আয়োজন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল তাহারই ইয়ার-বন্ধু, বাহিরের লোক আর কেহ নাই। সকলেই তৃপ্তির সহিত আহার করিল। আহারের পূর্ব্ব হইতেই সুরাদেবীর সেবা বিশেষ ভাবেই চলিতেছিল। সুধীর প্রথম কিছুতেই মদ্যপাত্র স্পর্শ করিতে সম্মত হয় নাই, পরে বন্ধু-বান্ধবগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এক গ্লাস মাত্র পান করিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর প্রলোভন ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। একটু আধটু করিয়া সেও মদ্যপান বেশ চালাইতে লাগিল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হইয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। অতিরিক্ত মদ্যপান করিলেই তাহার এরূপ অবস্থা হইত।

হঠাৎ কে একজন তাহাকে ধাক্কা মারিয়া তুলিয়া দিল। তখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। চোখ খুলিয়া চাহিতেই ঘরের ভিতর হরিশকে সে দেখিতে পাইল। হরিশ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাহার একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। হরিশকে দেখিবামাত্র সুধীর রাগে আত্মহারা হইয়া গেল। সে দেওয়ালে হেলান দিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে কিশোরীকে ডাকিয়া বলিল,—"কিশোরী,

আমি চল্লাম। তোমার চাকরকে বল, আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবে। এখানে জোচ্চোর এসেছে, তার সঙ্গে একঘরে বসতে আমি রাজি নই।"

সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া সুধীরের মুখের দিকে তাকাইল। কিশোরীমোহন বলিল,—"তুই কি স্বপ্ন দেখছিস্ নাকি? এখানে ত তেমন লোক কেউই নেই।"

এমন সময় হরিশ নিকটে আসিয়া সুধীরের হাত ধরিয়া বলিল,—"চল, চল, রামশরণ বাবুর আড্ডায় গিয়ে একটু খেলা যাগ গে! তাঁর অসুখ করেছে বলে তিনি এখানে আসতে পারেন নি।" হরিশ সুধীরকে আজও বেহুঁস দেখিয়া ভাবিয়াছিল এ সুযোগ ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

সুধীর রাগে ও ঘৃণায় হটিয়া যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"সরে যা, সরে যা, আমাকে ছুঁস্ নি। তোকে ছুঁলে দেহ অপবিত্র হয়,—ভাই" এই বলিয়া সে একবার সকলের দিকে তাকাইল,—"এই হরিশ, যে ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিয়ে এত কাল আমাদের সঙ্গে মিশে আসছে, এক পাকা জোচ্চোর, ঠক। আমাদের সঙ্গে কথা কবারও যোগ্য নয়।" পরে হরিশের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"দূর হ, আমাকে ছুঁতে আসিস্, এত বড় সাহস তোর!"

হতভাগ্য সুধীর! তাহার যদি কোনও হুঁস থাকিত, তাহা হইলে হরিশকে ঘরের ভিতর দেখিয়াই সে বিনা বাক্যবয়ে বাহির

হইয়া যাইত। যে সব কথা হরিশকে সে বলিল, তাহার একটিও বোধ হয় উচ্চারণ করিত না; কিন্তু তাহার পেটের মধ্যে শয়তান ঢুকিয়াছে, সেই শয়তানই তাহার মুখ দিয়া এই সব কথা বলাইল। হরিশ তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কারণ বুঝিতে পারিলেও কৃত্রিম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"ভাই, তোমরা সবাই শুনলে সুধীর মিছিমিছি আমাকে অপমান করলে। ও যদি ক্ষমা না চায়, তাহলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" হরিশ মুখে খুব তম্বিতাম্বা করিলেও পাপীর অন্তঃকরণ ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল। কিশোরীমোহন মধ্যস্থ হইয়া দু'জনের মধ্যে ঝগড়া মিটাইয়া দিতে চাহিল। হরিশের কথায় সুধীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিশোরী হরিশকে বলিল,—"ভাই, কিছু মনে করো না। সুধীরের হয়ে আমিই তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। নেশার ঝোঁকে কি বকছে, ওই জানে না।" এই বলিয়া সে এক গ্লাস জল লইয়া সুধীরের মাথায় চাপড়াইতে লাগিল।

সুধীর চেঁচাইয়া বলিল,—"কি, জোচ্চোরের কাছে ক্ষমা চাইব! তোমরা মনে করো না আমি মদ খেয়ে আবল তাবল বকছি, যা বলেছি, সব সত্যি। অমন বদমায়েস, পাজি, নীচ লোক পৃথিবীতে আর নেই বল্লেই হয়!"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর দাঁড়াইতেছে দেখিয়া ভয়ে হরিশের মুখের দিকে তাকাইল। এতটা বাড়াবাড়ি হরিশের অসহ্য হইল। সে ভাবিল এখনও চুপ করিয়া থাকিলে

সকলে সুধীরের কথায় বিশ্বাস করিতে পারে। "ফের, ঐ কথা, মিথ্যেবাদি!" এই বলিয়া সে হস্তস্থিত কাচের পানপাত্র ছুড়িয়া সুধীরকে মারিল। গ্লাসটা একেবারে তাহার মাথায় আসিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাটিয়া ফিনিক দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। সুধীর ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেল। সে জীবিত কি মৃত কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না।

কিশোরীমোহন দৌড়িয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার বাবু ক্ষতস্থানে মলমাদি প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলে সুধীরের একটু হুঁস হইল। কিশোরী তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, নতুবা বাড়ীতে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তাহাকে কতই না গোলযোগে পড়িতে হইত! ডাক্তার বাবু তাহাকে আশ্বাস দিলেন, আর কোনও ভয়ের কারণ নাই।

সুধীর চক্ষু মিলিয়াই বলিল—"আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আর একটু হোক। নইলে আবার নড়ানড়িতে রক্তস্রাব হলে প্রাণসংশয় হবে।"

কিন্তু সুধীর বাড়ী যাইবার জন্য বড়ই কাতর হইল। কিশোরী তখন ডাক্তার বাবুর পরামর্শ মত বিশেষ সাবধানে তাহাকে গাড়ীতে চড়াইয়া বাড়ী লইয়া চলিল। ডাক্তার বাবুও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

সুরমা যত রাত বাড়িতেছে, অথচ সুধীর বাড়ী আসিতেছে না দেখিয়া ভয়ে ও উদ্বেগে সে বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে

ছিল। তাহার চোখে একটুও ঘুম নাই। কেবল এপাশ ওপাশ করিতেছে ও স্বামীর মঙ্গল কামনায় ভগবানের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছে। এমন সময় কিশোরী সুধীরকে লইয়া বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় সুরমা কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল না। সে বুকে সাহস বাঁধিয়া ধীরভাবে স্বামীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল।

কিশোরীমোহন সারা রাত্রি জাগিয়া বন্ধুর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ভোরের বেলায় সুরমা চাকরকে দিয়া তাহাকে জানাইল, তাহার দাদাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইতে। সুরমা ললিতের পূরা নাম ঠিকানা কিশোরীকে কাগজে লিখিয়া দিল।

* * * *

সকাল তখন প্রায় আটটা বাজিয়াছে। ললিত তাহাদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় পিওন গিয়া তাহাকে টেলিগ্রামখানি দিল। "এ আবার কোথা থেকে!" এই বলিয়া ললিত কাগজে নাম সহি করিয়া দিয়া পত্রখানি লইল, কিন্তু পত্রখানি খুলিয়া পড়িয়াই সে আতঙ্কে একটু শিহরিয়া উঠিল। পাশেই শিবশঙ্কর বাবু উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ললিত পত্রখানি তাঁহার হাতে দিল। তাহার মর্ম্ম এই,—"গত রাত্রে সুধীরবাবুর এক

দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আপনি সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র চলিয়া আসিবেন। আপনার ভগিনী বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।"

"তাহলে ললিত, তুমি আর দেরী করো না, এখনই যাও। গিয়েই আসল খবর জানিয়ে আমাকে টেলিগ্রাম করবে, আমারও যাওয়া দরকার বুঝলে জানাবে।" শিবশঙ্কর বাবু বিষণ্ণভাবে ললিতকে এই কথাগুলি বলিলেন।

ললিত মুহূর্ত্তমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া পোষাক পরিয়া ষ্টেসনে চলিয়া গেল। হাওড়ায় পৌঁছিয়া ললিত একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল এবং গাড়োয়ানকে বখ্‌শীষের লোভ দেখাইয়া দ্রুত গাড়ী হাঁকাইতে বলিয়া দিল। কিশোরী তখন ডাক্তার ডাকিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুধীরের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী আসিয়া থামিল। কিশোরী দেখিল একটি সুশ্রী সম্ভ্রান্ত যুবক গাড়ী হইতে নামিল। কিশোরী বুঝিল ইনিই ললিত বাবু। সে তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর আনিয়া বলিল,—"মশায়ের নামই বোধ হয় ললিত বাবু! আপনি দেখছি আমার টেলিগ্রাম পাবামাত্র চলে এসেছেন। ব্যাপার বড়ই গুরুতর হয়েছে!"

"সুধীরের কি হয়েছে?"

"তার মাথা কেটে গেছে। সকালে যেমন ছিল, এখন যেন বোধ হয় অবস্থা আরও খারাপ!"

"কি করে মাথা কাটলো?"

"হরিশ বলে এক লোকের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। সে কাচের গেলাস ছুড়ে সুধীরকে মারে। গেলাসটা জোরে সুধীরের মাথায় এসে লেগে তার মাথাটা কেটে যায়। আপনি ভেতরে যান। আমি ডাক্তার বাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আসি।"

ললিত বাড়ীর ভিতর গিয়া সুধীরের ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল সুরমা শয্যাপ্রান্তে শান্তভাবে বসিয়া আহত স্বামীর সেবা করিতেছে, আর সুধীর যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে। ললিতকে দেখিয়া সুরমার বুকে অনেকটা সাহস বাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু সে ভায়ের নিকট নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিল না। ললিত সুধীরের পাশে গিয়া বসিল। সুধীর তাহাকে দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইল। সে ললিতের হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার নিস্প্রভ চক্ষুর্দ্বয়ে তীব্র অনুতাপের রেখা যেন প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে!

সুরমা দাদাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিল,—"কথা কইতে একেবারে বারণ। ডাক্তার সাহেব বলে গেছেন একেবারে চুপ করে থাকতে।"

সুধীর ধীরে ধীরে বলিল,—"ললিত, আমি যদি তোমার মত হতুম!"

সুরমার মনের জোর ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিল। তাহার সুন্দর নেত্রপ্রান্ত দিয়া অশ্রুকণা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে স্বামীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—"কথা কয়ো

না। ডাক্তার সাহেব যে কথা কইতে বারণ গেছেন।”

সুধীরের প্রাণের ভিতরটা তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হ ছিল। সে সুরমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে লাগিল,—“হায়, মদ যদি না খেতাম, তাহলে আমার এ দশা হতো না। ভাই, অনেকটা ভাল হয়ে এসেছিলাম, সঙ্গদোষে পড়লে আর মনের জোর তত থাকে না। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তাহলে প্রতিজ্ঞা করছি মদ আর স্পর্শও করবো না।’

ললিত ধীরে ধীরে বলিল,—“চুপ কর। কথা কইলে অসুখ বাড়বে।”

সুধীর চুপ করিল। ললিত ও সুরমা নীরবে তাহার পাশে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই কিশোরী ডাক্তারদের সঙ্গে লইয়া ঘরের ভিতর উপস্থিত হইল। ডাক্তারেরা রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বাহিরে উঠিয়া আসিলেন। ললিত তাঁহাদের পিছু পিছু আসিয়া নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল,—“বিশেষ ভয়ের কোনও কারণ আছে?”

“অবস্থা বড় সাংঘাতিক। স্পষ্ট জ্বরও হয়েছে। বিকার আরম্ভ হলে আর রক্ষা নেই।”

ললিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার পিতাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। দিনের আলো

ঙ্গে সঙ্গে সুধীরের জীবন-প্রদীপও নির্ব্বাপিত-প্রায় ল। ডাক্তারেরা ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন কিন্তু চেষ্টা করিয়াও রোগীর যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিলেন না। ভৃত্য আসিয়া ঘরের ভিতর আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।

"আলোটা সরিয়ে নিয়ে যাও।" সুধীর ক্ষীণস্বরে বলিল।

সুরমা আলোটা ঘর হইতে সরাইয়া বাহিরে লইয়া গেল। সুধীর ললিতের দিকে তাহার দুর্ব্বল ডান হাতখানি বিস্তার করিয়া দিল। ললিত তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের নিকট সরিয়া গেল।

"ললিত, ভাই, আমি চল্লাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার শেষ ঘনিয়ে আসছে। সুরমা অন্তঃসত্বা, তাকে দেখো, আর ছেলেপিলে হলে তার ভার তোমার উপর দিয়েই আমি চল্লাম। যদি ছেলে হয়, বড় হলে তার বাপের মৃত্যুর কথা তাকে শুনিও, তাহলেই বোধ হয় সে সাবধান হয়ে যাবে!"

ললিত কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। কেবল প্রাণের আবেগে তাহার হাতখানি জোর করিয়া ধরিয়া রহিল। সুধীর ইহার অর্থ বুঝিল এবং তাহার হাতে সুরমাকে রাখিয়া যাইতেছে ভাবিয়া সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। এমন সময় সুরমা ঘরের ভিতর ফিরিয়া আসিল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে শিবশঙ্কর বাবু আসিয়াছেন, ডাক্তারদের সহিত কথা কহিতেছেন। ললিতও বাহিরে চলিয়া গেল।

সুধীর সুরমার মুখখানিকে নিজের মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"সুরমা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে!"

সুরমা এ কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল না, মূর্চ্ছিতও হইল না। নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত অন্তঃকরণটা দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। তাহার বদনে ও কপোলদেশে স্বেদবিন্দু ঝরিতে লাগিল।

সুধীর পুনর্ব্বার কথা কহিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর এত মৃদু যে, সুরমা অতি কষ্টে তাহার কথা বুঝিতে পারিল—"সুরমা, আমার জন্যে কেঁদো না, আমি অতি পাষণ্ড, তোমাকে একদিনও সুখী করতে পারি নি। সমস্ত দিন ধরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, আমার দোষ ক্ষমা কর, আমাকে নব জীবন দান কর, এ রকম করে মরতে যে প্রাণ চাচ্ছে না! সারা জীবনেও একটা ভাল কাজ করে যেতে পারলাম না! ভগবান তা শুনলেন না! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঠিকই হয়েছে। জীবনটা বৃথায় গেল!"

গভীর যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সুরমা বলিয়া উঠিল,—"তোমায় ছেড়ে আমি তো বাঁচতে পারবো না।"

"তোমার ছেলে হবে,—তার জন্যে ত তোমাকে বাঁচতেই হবে! আর আমার শেষ আদেশ ছেলেটিকে মানুষ করে তুলো। ললিতকেও বলেছি তোমাদের ভার নিতে। সে নিশ্চয়ই

আমার কথা রাখবে। আবার,—আবার যথাসময়ে আমাদের দুজনের নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হবে।"

সুরমার চক্ষে অশ্রুপ্রবাহ ঝাঁপাইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। পাছে সুধীর তাহা লক্ষ্য করে, এই ভয়ে সে একধারে মুখ সরাইয়া লইল; কিন্তু সুধীর পুনর্ব্বার তাহা টানিয়া আনিয়া নিজের মুখের উপর রাখিল। হায়, চিরবিদায়ের পূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রীর এ শেষ মিলন, এ দৃশ্য কি করুণ! শিবশঙ্কর বাবু ডাক্তারদের সঙ্গে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। চাকরে আলো দিয়া গেল। সুরমার আর তখন লজ্জা-সরম জ্ঞান নাই। সে স্বামীর চরণতলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

একজন ডাক্তার সুধীরের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ললিতকে বলিলেন,—"আপনার ভগিনীকে সরিয়ে নিয়ে যান। আর বেশী দেরী নেই।"

সুরমা তাহা শুনিয়া উঠিয়া বসিল। স্বামীর দিকে তাকাইয়া সব বুঝিল; পরে "বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া আবার স্বামীরই চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।

সকলেই স্থির করিল রোগীর প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে। ললিত সুরমাকে জোর করিয়া অন্য ঘরে লইয়া গেল; কিন্তু রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারদের মনে কি রকম একটা সন্দেহ হইল। তাঁহারা তাহার নাসিকার নিকট দর্পণ ধরিয়া

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন রোগীর তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। সুধীর সেই অবস্থাতেই কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিল। পরে তাহার অবস্থা ক্রমেই একটু ভালর দিকে আসিতে লাগিল। দৈব অনুগ্রহে সুধীর সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। তাহাতেই লোকে বলিয়া থাকে, 'রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ?'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর আরও কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে; ইতিমধ্যে শিশির প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় ডাক্তারি পড়িতে আসিয়াছে। শিশিরের কলিকাতা আসার পক্ষে শিবশঙ্কর বাবুর আদৌ সম্মতি ছিল না। শিশিরের উপর তাঁহার তিলমাত্রও বিশ্বাস ছিল না। শিশির পরীক্ষায় পাশ হইবার পরই শিবশঙ্কর বাবুর ইচ্ছা ছিল তাহাকেও ললিতের সহিত নিজের কাজে বাহির করিতে; কিন্তু শিশির গোঁ ধরিয়া বসিল, কিছুতেই সে কারবারে ঢুকিবে না। ব্যবসায় করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করা যে ভদ্র লোকের পক্ষে বড়ই হেয় ও লজ্জাজনক, এতদিন লেখাপড়া শিখিয়া তাহার মনে সে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সে তাহার মাতার নিকটও এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, এ নীচ কাজ করিয়া সে তাহার হস্ত কলুষিত করিতে পারিবে না। চপলাও তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিত।

পাশের খবর বাহির হইবার পর শিবশঙ্কর বাবু শিশিরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার আর পড়ে কাজ নেই। আমার সঙ্গে কাজে বেরোও। তোমরা দুজনে কাজকর্ম্ম শিখে নিলে আমি একটু জিরেন পাবো।"

শিশির বলিয়া বসিল,—"আমি ডাক্তারি পড়বো।"

শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। দুই ভায়ে মিলিয়া একসঙ্গে কারবার দেখিলে বিস্তর লাভ হইবে। তাহাতে তাহাদের দু'জনেরই ভবিষ্যতে খুব সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইতে পারে; কিন্তু শিশির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে ডাক্তারি পড়িবেই। সে এমন কি পিতাকে ইহাও বলিতে ছাড়িল না যে, যদি তাহার ডাক্তারি পড়া না হয়, তাহা হইলে সে বাড়ীতে চুপ করিয়া বরং বসিয়া থাকিবে, তবুও তাঁহার সহিত কারবারের কাজে যোগদান করিতে পারিবে না। কুশিক্ষার ফল অবাধ্য পুত্রের উপর ইতিমধ্যেই কিরূপ ভীষণ ভাবে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া শিবশঙ্কর বাবুর কষ্টের সীমা রহিল না। তিনি শিশিরকে আর বেশী কিছু বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন।

সেদিন এ বিষয়ের কিছুই স্থির মীমাংসা হইল না। দিনকতক পরে শিশির একদিন ললিতকে ধরিয়া বসিল,—"দাদা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল, যাতে আমার পড়াটা হয়। মা বল্লেন, বাবার মত করাতে তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি। বাবা তোমার কথা শুনেন। তুমি একটু বল্লেই বাবার নিশ্চয়ই মত হবে।"

শিশিরের স্বভাব-চরিত্রের উপর পূর্ব্ব হইতেই ললিতের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। ললিত বুঝিল শিশিরের ডাক্তারি পড়িবার ঝোঁক আর কিছুরই জন্য নহে, কেবল কলিকাতায় থাকিয়া

উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিবার প্রবল বাসনা। শিশিরও যথার্থই সেই জন্যই, বিলাস-সাগরে ভাসিবার জন্যই, কলিকাতায় পড়িতে যাইতে চায়। ললিত তাহাকে বলিল,—"না ভাই,—বাবার যখন অমত হয়েছে, আমি তাঁকে আর বলতে পারবো না। তিনি ত তোমার ভালর জন্যেই এ কথা বলছেন? কেন তুমি অমত করছো? চলো দুজনে মিলে কাজ কর্ম্ম শেখা যাগ্‌গে।"

দাদার স্নেহ ও ভালবাসার উপর শিশিরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে ভাবিয়াছিল দাদাকে ধরিলে সে নিশ্চয়ই পিতাকে বুঝাইয়া বলিবে; কিন্তু এখানেও বিফল হইয়া সে খানিকটা দমিয়া গেল। যাহা হউক পরে মাতার সাহায্যে তাহারই জিদ বজায় রহিল। সে কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইল। পরে কলেজের মেসে থাকিবার বন্দোবস্ত সব ঠিক করিয়া বাড়ীতে পত্র দিল।

শিবশঙ্কর বাবু এবার ললিতের বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানাস্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। এমন যোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিলে অনেক কন্যার পিতামাতাই আপনাদের ধন্য মনে করিবে; কিন্তু ললিত পিতাকে বুঝাইয়া বলিল, আর কিছুদিন না গেলে সে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে না। সে সুরমার নিকট বিবাহ না করিবার যে প্রধান কারণটা উল্লেখ করিয়াছিল,

পিতার নিকট লজ্জায় তাহা আর প্রকাশ করিতে পারিল না। অধিকন্তু বিবাহের পরও সুধীরের চরিত্র সম্পূর্ণ সংশোধিত হইল না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিশিরকুমারও দিন দিন অবাধ্য ও অশান্ত হইয়া উঠিতেছে, বাড়ীতে চপলার নির্দ্দয় ব্যবহার, এই সব দেখিয়া শুনিয়া সংসারের উপর তাহার কিরূপ একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এই সবের একটা সুবিধাজনক কিনারা করিতে না পারিলে, কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দ বিধানের জন্য সে বিবাহ করিবে না। শিবশঙ্কর বাবু ললিতের কোনও প্রস্তাবে কখনও আপত্তি করেন নাই, এ ক্ষেত্রেও করিলেন না। চপলাও ললিতের বিবাহের জন্য আদৌ ব্যস্ত ছিল না। বিবাহের কথাবার্ত্তা আর উত্থাপিত হইল না।

*　　*　　*　　*

শিশির আজ ছয় মাস হইল কলিকাতায় আসিয়াছে। প্রতি মাসেই গত মাসের অপেক্ষা তাহার খরচের মাত্রা বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাকে খরচ পাঠানর জ্বালায় শিবশঙ্কর বাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন। সে বিষয়ে তাহাকে পত্র দিলে শিশির উত্তর দেয়, সে কি করিবে, সে সহস্র চেষ্টা করিয়াও ইহার অপেক্ষা কম খরচে চালাইতে পারিতেছে না। আসল কথা শিবশঙ্কর বাবু ও ললিত যে ভয় করিয়াছিল ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে তাহাই দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতায় শিশিরের মাথার উপর কেহই দেখিবার

নাই। অসৎসঙ্গে পড়িয়া সে ক্রমেই ধ্বংসের মুখ অগ্রসর হইতেছে। বিলাসপুরে থাকিয়াও শিবশঙ্কর বাবুর কাণে তাহার দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের কথা পৌঁছিতে লাগিল। গ্রীষ্মের অবকাশে শিশিরের কলেজ বন্ধ হইলে শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। শিশির উত্তরে লিখিল, এখানে কলেজে তাহার পড়াশুনার বড় তাড়া পড়িয়াছে, সে এখন দেশে যাইতে পারিবে না। ছুটিটা দেশে গিয়া নষ্ট না করিয়া কলিকাতায় বন্ধু-বান্ধবের সহিত স্ফূর্ত্তি করিয়া কাটানই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। শিবশঙ্কর বাবু সুধীরকে ও কালীবাবুকে ভিতরকার সংবাদের সন্ধান লইবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহারা উভয়েই উত্তরে জানাইল যে, শিশিরের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের মনে বড় সন্দেহ জন্মিয়াছে, তিনি একবার স্বয়ং কলিকাতায় আসিতে পারিলেই ভাল হয়।

শিবশঙ্কর বাবু ব্যথিত হৃদয়ে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। চপলাও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশায় তাঁহার সহিত আসিল। তাঁহারা কালীবাবুর বাড়ী গিয়া উঠিলেন। শিবশঙ্কর বাবু প্রথম সুরমার সহিত দেখা করিলেন এবং সুধীরকে বেশ সুস্থ ও সবল দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। পরে নিভৃতে সুরমার নিকট যখন শুনিলেন যে, সুধীর একেবারে সৎপথে আসিয়াছে, তাহার চরিত্রে আর কোনও দোষই নাই, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া

বলিলেন,—"মা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই স্বামীসুখে সুখী হবি।" পরে তিনি সুধীরকে সঙ্গে লইয়া শিশিরের সন্ধানে বাহির হইলেন।

শিশিরের মেসে গিয়া শিবশঙ্কর বাবু তাহার দেখা পাইলেন না। অপর এক ছাত্রের নিকট সংবাদ পাইলেন, সে সকালে কোথায় এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে, বোধ হয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবে না। শিবশঙ্কর বাবু বিষণ্ণ বদনে ফিরিয়া আসিলেন। পরে সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার তাহার সন্ধানে গিয়া দেখিলেন, শিশির তখনও ফেরে নাই। তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে তাহার সাক্ষাৎ লাভে বিফল হইয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় সেই ছাত্রের নিকট শিশিরের নামে এইমর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া আসিলেন যে, তাঁহারা সকলে কালীবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছেন, শিশির বাসায় আসিবামাত্র যেন সেখানে তাহাদের সহিত দেখা করে।

শিশির সমস্ত দিন আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া পিতার পত্র পাইল। সারাদিন পরিশ্রমের পর সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, একবার ভাবিল, রাত্রে আর থাক, কাল সকালে উঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেই চলিবে; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, না, রাত্রে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, নচেৎ তাহারা মনে করিবে রাত্রে আমি বাসায় ফিরি নাই। সে বিরক্ত হইয়া কালীবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল।

তাহাকে দেখিয়া শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন,—"ছুবার তোমার বাসায় গেছি, ছুবারই তোমার দেখা পাই নি। সমস্ত দিন বন্ধুর বাড়ী আড্ডা দিয়ে পড়াশুনা করা হচ্ছে বুঝি? বাড়ী যাবার বেলাই যত কাজের ওজর।"

শিশির উত্তর করিল,—"না, আমি বিশেষ কাজেই তার বাড়ী গেছলাম। এইমাত্র বাসায় এসে আপনার পত্র পেলাম।"

শিশির পিতার তিরস্কারের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় মাতার নিকট গিয়া বসিল। চপলা তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—"একি মুখে এত তামাকের গন্ধ বেরুচ্ছে কেন?"

"মা, যদি একবার দেখ, যখন মড়ার ঘরে ঢুকতে হয়, কি ভয়ানক দুর্গন্ধ! তাই বাধ্য হয়ে চুরুট খেতে হয়। নইলে সে গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত শুদ্ধ উঠে আসবে।"

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শিবশঙ্কর বাবু স্ত্রীকে ইঙ্গিত করিয়া সে ঘর ত্যাগ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল যে, চপলাই শিশিরকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের জন্য ভৎর্সনা করিবে। শিবশঙ্কর বাবু চলিয়া গেলে চপলা শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁরে, এ সব কি শুনতে পাচ্ছি, তুই নাকি খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে বদখেয়ালী করে বেড়াচ্ছিস্? মাসে মাসে অত টাকা ধূলোর মত উড়িয়ে দিচ্ছিস্?"

"এ সব বাজে কথা কে তোমাদের বল্লে? তোমরাও সে কথায় বিশ্বাস করেছ?"

"আমার বিশ্বাস হয় না বটে, তবে উনি শুনে পর্য্যন্ত একে-বারে রেগে টং হয়ে গেছেন। বলেন তোর খরচ পত্র সব বন্ধ করে দেবেন। ললিতও মুখ গম্ভীর করে আছে। ওরা বলে, তোর মাসে অত খরচ যোগাতে পারবে না।"

"ওরা বলতে পারে, পাড়াগাঁয়ে থাকে, সহরের খরচা কত তা জানবে কি করে? আমাকে বড় লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হয়। তাদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে না পারলে অপমানে মাথা হেঁট হয়ে যায়। দাদা যে কলকাতায় ছিলেন, কারও সঙ্গে মিশতেন না, ভিজে বেড়ালের মত ঘরের কোনেই বসে থাকতেন, তাঁর অল্প খরচেই মাস চলে যেত। আমি তা পারবো না, বলে দিচ্ছি। আমার যাক প্রাণ, থাক মান। নিজের মান বজায় রেখে চলতেই হবে। কারবারে এত রোজগার হচ্ছে, আর আমাকে এই সামান্য টাকা দিতে আপত্তি করলে চলবে কেন?"

"তুমি, বাবা সাবধান হয়ে চলো; ওদের কথা শুনে আমার বড় ভয় হয়েছে।"

শিশির হাসিতে হাসিতে বলিল,—"মা, তুমি কিছু ভয় পেয়ো না। এবার থেকে আমি কম খরচেই চালাতে চেষ্টা করবো। যে

যাই বলুক, তাদের কথায় বিশ্বাস করো না। ভদ্রঘরের ছেলের যেমন ভাবে চলা উচিত, আমি ঠিক সেই ভাবেই চলবো।”

চপলা ইহাতে পুত্রের কোন দোষই দেখিতে পাইল না। সে ভাবিল, শিশির ঠিকই বলিয়াছে। পুত্রের সম্বন্ধে তাহার মনে পূর্ব্বে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহা দূর হইয়া গেল। পুত্রগর্ব্বে তাহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। এমন সুদর্শন গুণবান পুত্র কয় জন মাতা গর্ভে ধারণ করিতে পারে? চপলা নিজের মনে মনে বলিল,—“লোকে হিংসেয় আমার ছেলের নামে মিথ্যে কথা বলে বেড়ায়। ছেলে বিগ্‌ড়ালে তার চেহারা কি এত ভাল থাকে? নিশ্চয়ই মুখপোড়া লোকদের হিংসে হয়! খরচ যে বেশী করে, তাতে তারই বা দোষ কি? ভদ্রলোকের মত থাকতে গেলেই খরচ হয়ে পড়ে। কারবারে অত রোজগার, আর এই টাকা ওকে না দিতে পারলে চলবে কেন?”

চপলা শিবশঙ্কর বাবুকেও ঐরূপই বুঝাইয়া দিল। শিবশঙ্কর বাবু সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় আসার ফল এইখানেই পর্য্যবসিত হইল। শিবশঙ্কর বাবু যে আঁধারে সেই আঁধারেই রহিয়া গেলেন। পুত্রের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে এই ভাবিয়া তিনি বিষণ্ণচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চপলার উপদেশে শিশিরের স্বভাব-চরিত্রের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী খরচ করিয়া স্ফূর্ত্তি চালাইতে লাগিল। টাকার অভাব হইলেই বাড়ী হইতে কেবল খরচের টাকা চাহিয়া পাঠায়; কিন্তু শিবশঙ্কর বাবু মনস্থ করিলেন যে মাসিক নির্দ্দিষ্ট টাকা ব্যতীত এক পয়সাও তিনি আর বেশী পাঠাইবেন না। শিশির টাকা ধার করিয়া হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া খরচ যোগাইতে লাগিল, কিন্তু যখন সে সব দেনা শুধিবার আর কোনও উপায় দেখিল না, পাওনাদারেরা টাকার জন্য আদালতে নালিশ করিবার ভয় দেখাইল, শিশির একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। সে তখন বাড়ী গিয়া পিতাকে ও দাদাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, খরচের টাকা না বাড়াইলে তাহার আর চলে না। শিবশঙ্কর বাবু কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না, তিনি বরং তাহাকে বলিলেন,—"আর তোমার পড়ে কাজ নেই, তুমি কলেজ ছেড়ে বাড়ীতে এসে বস।" শিশির রাগে গরগর করিতে লাগিল। সৎ উপায়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া সে অসৎ উপায় অবলম্বন করিল, কলিকাতা যাইবার সময় শিবশঙ্কর বাবুর ব্যাঙ্কের চেকবহিখানি সঙ্গে লুকাইয়া লইয়া গেল।

শিশির কলিকাতায় গিয়া বাপের নামসহি জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে লাগিল। ছয় মাসের মধ্যে সে ব্যাঙ্ক হইতে সমস্ত টাকা তুলিয়া উড়াইয়া দিল। শিবশঙ্কর বাবু টাকার বিশেষ দরকার না পড়িলে, বৎসরের মধ্যে দু'বার কি তিনবারের বেশী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতেন না। একদিন টাকার দরকার হইলে তিনি চেকবহির অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার ভয় হইল, শিশিরের উপরই তাঁহার প্রথম সন্দেহ পড়িল। পরে তিনি ব্যাঙ্কে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, তাঁহার হিসাবে ব্যাঙ্কে টাকা আর জমা নাই, গত ছয় মাসের মধ্যে তিনি তাঁহার গচ্ছিত সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ত শুনিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বুকের পাঁজরা-কয়খানা একেবারে ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। কেবল যে অর্থনাশের জন্যই তাঁহার মনঃকষ্ট তাহা নহে, পুত্রের ব্যবহারের কথা ভাবিয়া তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত, ললিতের সঙ্গে তিনি যুক্তি করিতে বসিলেন। টাকা লইয়া এখন গোলমাল করিতে গেলেই শিশিরকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হয়। সেই যে এ কাজ করিয়াছে, তাহাতে শিবশঙ্কর বাবু ও ললিতের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না এবং সহি জাল করার অপরাধে ধৃত হইলে, তাহাকে যে দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া শিবশঙ্কর বাবুও শিহরিয়া উঠিলেন।

শিবশঙ্কর বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ললিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহলে এখন কি করা যায়? পুলিশকে খবর দেব। কুলাঙ্গার ছেলের জন্যে এই বয়সে আমাকে এত কষ্টও ভোগ করতে হচ্ছে! ও রকম ছেলে মরলেই বা ক্ষতি কি?"

ললিত ধীরভাবে উত্তর করিল,—"না বাবা, পুলিশে এখন খবর দিয়ে কাজ নেই। আমি প্রথম কলকাতায় গিয়ে তার কাছে সব সংবাদ নিই। পরে যেমন ভাল বোঝা যাবে, তাই করা যাবে। শিশিরই যদি টাকা নিয়ে থাকে, তাহলে গোল-মাল করে আর ফল কি? তাকে ত আর আমরা জেলে দিতে পারবো না। আমাদের বংশের নামে কালি পড়বে, আমাদেরও সমাজে খাট হয়ে থাকতে হবে।"

"তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আসবে। আর তাকে কলকাতায় পড়তে হবে না।"

"বাড়ী নিয়ে আসবো?"

"তা ছাড়া আর উপায় কি? ললিত, তার আর পড়াশুনা কিছু হবে না। ক্রমেই একেবারে উৎসন্ন যাবে। তখন আর তার কোন আশাই থাকবে না। আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করে ছাড়বে।"

"তাহলে দেখি, কতদূর কি করতে পারি।"

"হাঁ, যেমন বুঝবে তেমনি করবে। আমি তোমাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিলাম।"

"সে বোধ হয় বাড়ী আসতে চাইবে না।"

শিশিতাকে আসতেই হবে। যেমন করে পার, তাকে সঙ্গে ব্যাঙ্করে নিয়ে আসবে। বুঝিয়ে না পার, পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে নিয়ে আসবে। আমি প্রথমেই তাকে কলকাতায় পড়তে আসতে দিতে রাজি হই নি। আমি ভেবেছিলাম ভবিষ্যতে ব্যাপার এমনই দাঁড়াবে, ঠিক হলোও তাই!"

ললিত কলিকাতা যাত্রা করিল। কলিকাতায় আসিয়া সে একেবারে শিশিরের মেসে গিয়া উঠিল। তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অপর ছাত্রে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সে প্রথমে একটু বিস্মিত হইল, পরে ভাবিল হয় ত বা অন্য ঘরে সে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ললিত তখন সেই ছাত্রকে শিশিরের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, সে নূতন আসিয়াছে, এ মেসে শিশিরবাবু বলিয়া কোনও ছাত্রকে সে চেনে না। ললিত তখন মেসের যে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার নিকট গিয়া শিশিরের বিষয় প্রশ্ন করিল।

ললিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার ভাই শিশির-কুমার আপনাদের কলেজে পড়ে, পূর্ব্বে সে এই মেসেই থাকতো। এখন কি এখানে নেই?"

"সে ত আজ প্রায় একমাস হলো এখান থেকে চলে গেছে। আপনারা কি তার কথা সব শুনেন নি?"

"না, আমরা ত জানি সে এখানেই আছে!" ললিত হতভম্ব হইয়া এই উত্তর করিল।

"সে কলেজের মাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে কুকথা বলে, সেইজন্যে তার কলেজ থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।"

ললিত এ কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। ব্যাপার যে এত গুরুতর দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে তখন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি জানেন সে এখন কোথায় আছে?"

"না, তা ত জানি না। আমারা মনে করেছিলাম সে দেশেই ফিরে গেছে। দেখুন, তার স্বভাব চরিত্র বড় খারাপ হয়ে গেছে, আপনারা তার ওপর একটু বিশেষ নজর রাখবেন। এখানে অনেক দেনা টেনা করে গেছে, আমি তাকে অনেক বোঝাতাম, শুনতো না। বলে, আপনারা নাকি তার খরচ কমিয়ে দিয়েছেন, দেনা করা ভিন্ন অন্য উপায় আর ছিল না।"

"দেখুন, বাবা মাসে মাসে তাকে ঠিক নিয়ম মত খরচ পাঠাতেন। তা সত্ত্বেও প্রতি মাসে টাকার তাগাদা করে পত্র লিখতো। বাবা বিরক্ত হয়ে শেষে বেশী টাকা পাঠান বন্ধ করে দেন। সম্প্রতি তার সঙ্গে পথে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হয় নি?"

"কিছুদিন পূর্ব্বে একবার দেখা হয়েছিল, আর হয় নি।"

ললিত তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া আসিল। সে কি করিবে, কোন পথে যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শিশিরকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, যে প্রকারেই

হউক তাহাকে কলিকাতা হইতে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। সে তখন কালীবাবুর আফিসে গিয়া হাজির হইল। কালীবাবুর শরীর হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় তিনি হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্য দু'দিন পূর্ব্বে সপরিবারে বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। বিমল আফিসে ছিল। সে ললিতকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া কলিকাতা আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ললিত তাহাকে শিশিরের কথা জিজ্ঞাসা করিল, শিশিরের কোন সন্ধান সে দিতে পারে কি না। বিমল উত্তর করিল,—"সে কোথায় আছে, তা ত বলতে পারি না। তবে তার কলেজের এক ছেলের মুখে শুনলাম তার নাম কলেজ থেকে কেটে দিয়েছে। সে বুঝি আপনাদের কিছুই জানায় নি?"

"না, তার জন্যে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি, তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কি উপায় অবলম্বন করলে তার কোনও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন? আমি ত একেবারে বোকা বনে গেছি, কি করবো কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না, আপনি যদি একটা উপায় ঠিক করে দিতে পারেন।"

বিমল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"আচ্ছা দেখি, হরিদাস বাবু বলে আমার একজন চেনা লোক আছে। তিনি যদি তার সন্ধান কিছু বলে দিতে পারেন। আমি এখনই তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

বিমল আফিসের এক কর্ম্মচারীকে দিয়া হরিদাস বাবুকে

ডাকিয়া পাঠাইল। হরিদাস বাড়ীতেই ছিল, কর্ম্মচারীর সঙ্গেই আফিসে আসিয়া হাজির হইল। সে আসিতে বিমল তাহাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার মেয়ের বে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনি যা উপকার করেছেন তা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারবো না। আপনি টাকা দিয়ে সাহায্য না করলে কিছুতেই তার বে হতো না।"

"যাক্ ওসব কথা ছেড়ে দিন। এখন আমাকে একটা খবর দিতে পারেন ? শিশিরকুমার বলে কোনও যুবককে আপনি চেনেন ?"

"কে শিশিরকুমার ? যিনি ডাক্তারি পড়তেন ?"

"হাঁ, হাঁ, তাকে চেনেন নাকি ?" বিমল আগ্রহভরে এই প্রশ্ন করিল। ললিতও উৎসুক নয়নে হরিদাসের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"হাঁ, খুব চিনি। তিনি যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তাঁকে চিনি।"

ললিত এবার নিজেই হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন তিনি কোথায় আছেন, বলতে পারেন ?"

"তা ত ঠিক জানি না। পূর্ব্বে রামশরণ বাবুর আড্ডায় প্রায়ই তাঁকে দেখতাম। এখন আর সেখানে বড় আসেন না। তাঁর অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেছে।"

"টাকা লোকসান হয়েছে, কিসে? কিছু ব্যবসা করেছিল নাকি?"

হরিদাস হাসিয়া উত্তর করিল,—"না, ব্যবসা নয়। বাজির খেলায় বিস্তর টাকা তিনি হেরেছেন।" পরে বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"আপনার কাছে কোনও কথা লুকুবো না; কিন্তু কারও কাছে আমার নাম করবেন না। শিশিরবাবু আড্ডায় সবশুদ্ধ প্রায় দশ পনর হাজার টাকা হেরেছেন। তা ছাড়া মদে ও অন্যান্য বিষয়েও বিস্তর টাকা উড়িয়েছেন। পরে টাকার খাঁকতি হওয়ায় আর আড্ডায় বড় আসেন না। তবে তার পর দু একবার সন্ধ্যার সময় বৌবাজারের এক মদের দোকানে তাঁকে মদ খেতে দেখেছিলাম। সেখানে যদি তাঁর দেখা পাওয়া যায়।"

বিমল দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিল,—"হায়, এক মদই পৃথিবীর কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ সাধন করছে!"

পরে তাহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিল, ললিত হরিদাসের সহিত আজ রাত্রে বৌবাজারের সেই মদের দোকানে গিয়া এক-ধারে বসিয়া থাকিবে, যদি শিশির আজ সেখানে আসে। হরিদাস এ বিষয়ে ললিতকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

ললিত যথাসময়ে হরিদাসের সহিত মদের দোকানে গিয়া হাজির হইল। পরে হরিদাস খানিকটা মদ কিনিয়া পাশের ঘরে

গিয়া বসিল। ললিতও সেখানে তাহার অনুসরণ করিল। একে একে মদ্যপায়ীগণ নিশাচরের ন্যায় দোকান ঘরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ললিত একদৃষ্টে তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকেই এক আধ গ্লাস পান করিয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট জনকতক পাশের ঘরে মদের পাত্র লইয়া গিয়া মনের আনন্দে পান করিতে লাগিল। চানাচুর, হাঁসের ডিম বা কেঁকড়া ঝালদে যাহার যাহাতে রুচি মদের সহিত চাটরূপে গিলিতে লাগিল। অতিরিক্ত পানান্তর কেহ বা একেবারে বেঁহুস হইয়া বেঞ্চির উপরই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল, কেহ বা মনের স্ফূর্ত্তিতে গান গাহিতে গাহিতে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ বা অপরের সহিত অভদ্র ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিল। সে আলাপের ভাষা শুনিলেও পাপ হয়। নরকের দৃশ্য ইহাপেক্ষা আর কি বেশী ভয়ঙ্কর ও ঘৃণাজনক হইতে পারে, তাহা ললিত কল্পনাও করিতে পারিল না। দেখিল একজন পকেটের টাকা মদ্যপানে উড়াইয়া দিয়া পরে নিজের ঘড়ি বাঁধা দিয়া আরও মদ লইল। একজন স্ত্রীলোক বোধ হয় দাসী হইবে, এক বোতল মদ কিনিয়া কাপড়ে ঢাকা দিয়া লইয়া গেল। এই সব দেখিয়া এক তিল আর সেখানে থাকিতে ললিতের প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু ললিত যাহার সন্ধানের জন্য নিজের বিবেকের বিরুদ্ধেও এই নারকীয় স্থানে আসিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল না।

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল, দোকানদার সকলকে স্ব স্ব বাড়ী যাইবার জন্য তাড়া দিল, অথচ শিশির তখনও আসিল না। হরিদাস বলিল, আজ আর তাহার আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ললিত দোকান হইতে বাহির হইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শিশিরের ন্যায় ভদ্রবংশের সন্তান কি প্রকারে এই সংসর্গে মিশিতে পারে, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ললিত সে রাত্রি বিমলদের বাড়ীতেই কাটাইল। পরদিন সকালে উঠিয়া সে সুধীরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সুধীর ললিতকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিল। ললিত প্রথম সুধীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

সুধীর উত্তর করিল,—"হাঁ এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি। তুমি কবে কলকাতায় এলে, আমরা ত কিছু শুনি নি।"

"আমি কাল হঠাৎ বিশেষ কাজে এসেছি। কাল আর তোমাদের এখানে আসবার সময় করে উঠতে পারি নি। আজ সমস্তদিন এখানেই আছি। খোকা কেমন আছে?"

এমন সময় সুরমা ঘরের ভিতর ঢুকিল। সুধীর উত্তর করিল,—"হাঁ, খোকা ভাল আছে। চাকরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। তোমার বোনের চোখে ত এমন সুন্দর শিশু আর কারও জন্মায় নি!"

সুরমা চুপি চুপি ললিতকে বলিল,—"দাদা, খোকা খুব শান্ত আর দেখতেও বেশ ফুট্‌ফুটেটি হয়েছে!" সন্তানগর্ব্বে নবীনা জননীর বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল।

সুধীর তাহা শুনিতে পাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—"তা, বাপের গুণগুলিই সব ঠিক পেয়েছে।"

সুধীর ও ললিত দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। সুরমাও মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরমা চলিয়া গেলে ললিত সুধীরকে বলিল,—"তোমাকে সুস্থ দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার মনে বড় সন্দেহ ছিল, তুমি বোধ হয় আর পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরে পাবে না।"

"ভাই আমি পুনর্জীবন লাভ করেছি, কিন্তু যথার্থই অতটা দয়ার যোগ্য পাত্র নই।"

"তুমি এখন সে সব বদ অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিয়েছ ত ?"

"হাঁ ভাই ছেড়েছি এবং ভগবানের অনুগ্রহে আশা করি শেষ পর্য্যন্ত এ মনের জোর বজায় রাখতেও পারবো। সে রাত্রে যখন তোমরা সবাই আমাকে মৃত বলে ধারণা করেছিলে, মুমূর্ষু অবস্থায় আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে তিনি দয়া করে আমাকে এ যাত্রা মৃত্যুমুখ হতে রক্ষা করুন। পৃথিবীতে আরও বেশী দিন বেঁচে জীবনটাকে যে পুরাপুরি মাত্রায় ভোগ করবার জন্যে আমি প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম, তা নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে। সারা জীবনটা নষ্ট করে অমন ভাবে মরতে আমার বড় অনুতাপ হচ্ছিল। হঠাৎ দৈব বলে যেন মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হলো। শিরার ভিতর রক্ত চলাচল আরম্ভ হলো। ডাক্তারেরাও ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। মৃত ব্যক্তির প্রায় সকল লক্ষণই আমার দেহে

দেখা দিয়েছিল। ঈশ্বরের এই অসীম দয়ার প্রতিদানে আমি কি আবার অসৎপথ অবলম্বন করতে পারি? গত পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করবার জন্যেই ভগবান আমাকে নবজীবন দিয়েছেন, যাতে তাঁর প্রদর্শিত পথে জীবন যাত্রা চালিত করতে পারি, যাতে সমাজের ও দেশের একটুও উপকারে আসতে পারি। চৈতন্য লাভের পরই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, প্রাণ গেলেও মদ আর স্পর্শ করবো না। মদ খেয়েই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। দেহে বল পাবার জন্যে ডাক্তারেরা আমাকে একটু একটু মদ খেতে দিতে পরামর্শ দেন; তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে, আমি তাও খেতে রাজি হই নি। নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এসেছি।"

"রোগীকে সুস্থ করবার জন্যে ডাক্তারেরা কেন মদ খাওয়াতে পরামর্শ দেয়, বুঝতে পারি না। আমি জানি, একজন অসুখে পড়ে নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডাক্তারের কথানুযায়ী রোজ এক গ্লাস করে পোর্ট মদ খেতে আরম্ভ করে। সেই অভ্যাস পরে ভাল হবার পরও সে কিছুতেই ছাড়তে পারে নে। মদ না খেলে কিছুতেই তার মনে স্বস্তি হতো না। এখন সে একজন পাকা মাতাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"একথা ঠিক। আমারও মনে হয় ডাক্তারদের কথা মত আমি যদি আবার মদ ধরতাম, তাহলে ভাল হয়ে নিশ্চয়ই সে অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারতাম না। যেমন ছিলাম, আবার ঠিক তেমনিই হয়ে যেতাম। এই প্রসবের পর শরীর শুধরাবার

জন্যে সুরমা আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই মদ খেতে চায় নে, অথচ সে এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। ছেলেটিও বেশ সুশ্রী, সবল হয়েছে ; কিন্তু সুরমার সম্মুখে যদি ছেলের প্রসংশা করি, তাহলে সে ধরাখানাকে একেবারে সরা জ্ঞান করবে। অমনিতেই ছেলের কথা বলতে তার মুখ দিয়ে লাল পড়ে।”

ললিত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“সে সব বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়েছ ত ?”

“হাঁ ভাই, রাস্তায় দেখা হলে কারও সঙ্গে দুটো কথা কই মাত্র। তাদের বাড়ী যাওয়া বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। তাদের দেখলেই আমার সে রাত্রের কথা মনে পড়ে যায়, আর ভয়ে সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠে। গভর্ণমেণ্ট এ সব মদের দোকান উঠিয়ে দেয় ত, দেশের একটা মহা হিত সাধন করে।”

“গভর্ণমেণ্ট তা কি করে করে ? তার কি ক্ষমতা আছে যে আইন জারি করে সে সকলকে বলবে, ‘তোমরা আর মদ ছুঁতে পাবে না, বা খেলেও এক গ্লাসের বেশী নয়।’ প্রজাদের নিজেদের মনের জোর না থাকলে কিছুই হবে না। গত রাত্রে আমি এক মদের দোকানে ঢুকেছিলাম।”

“তুমি !”

“হাঁ, বিশেষ দরকারে একজন লোককে খুঁজছিলাম, সংবাদ পেলাম, সেখানে গেলে তাকে ধরতে পারবো। রাত্রি

প্রায় নটা পর্য্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম, কিন্তু যে দৃশ্য দেখে এসেছিলাম, তাতে সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমুতে পারি নি। কি বীভৎস কাণ্ড, উচ্ছৃঙ্খলতার কি ভীষণ পরিণাম! হাঁ, শিশিরের সঙ্গে সম্প্রতি তোমার দেখা হয়েছিল কি?"

"না, তার হলো কি? সে দিন বিমলবাবুর মুখে শুনলাম কলেজ থেকে তার নাম কেটে দিয়েছে। সুরমাও তার জন্যে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আগে দু একবার আমাদের এদিকে আসতো, মাস দুই হলো একেবারে উধাও। আমি সে দিন তার বাসায় গিয়ে সব খবর পেলাম, সে সেখানে আর নেই।"

"আমিও তাই শুনলাম। বাড়ীতে কোনও খবর দেয় নে। বোধ হয় একেবারে অধঃপাতে গেছে।"

"আমারও তাই সন্দেহ হয়। সঙ্গদোষে পড়ে স্বভাব চরিত্র বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে গেছে।"

এমন সময় সুরমা তাহার শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। শিশুটি যে দেখিতে অতীব সুশ্রী, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুরমা তাঁহাকে দাদার কোলে তুলিয়া দিল। ললিত তাহাকে কোলে করিতেই শিশু খেলার ছলে তাহার গোঁফ ধরিয়া টানিল। ললিত যন্ত্রণায় চেঁচাইয়া উঠিল। সুধীর হাসিতে হাসিতে পুত্রকে নিজের কোলে লইয়া বলিল,—"না, তুমি কোনও কাজের নও। দেখ, কেমন করে ছেলে ভুলাতে হয়!"

ললিত বলিয়া উঠিল,—"তোমার অভ্যাস আছে। আমি যে একবারে আনাড়ি!'

"আর কবে সানাড়ি হবে? জীবন যে কেটে এলো!"

"আর কি করি? নানা দুশ্চিন্তায় মন বড় খারাপ হয়ে আছে। এই শিশিরকে নিয়ে এখন বড় ভাবনায় পড়েছি। তাকে কোনও রকমে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।"

শিশির সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই কথাবার্ত্তা হইল। ললিত সুধীরকে ভিতরের কথা খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করিল না। তবে সুরমার নিকট সে সংবাদ পাইল যে, শিশির শেষ যখন তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসে, সে সুধীরের নিকট হইতে দুই শত টাকা ধার বলিয়া লইয়া যায়। সেই হইতে আর সে এ বাড়ী মাড়ায় নাই।

সন্ধ্যার সময় ললিত সুধীর ও সুরমার নিকট বিদায় লইল। বলিয়া গেল, বোধ হয় রাত্রে সে আর ফিরিবে না; যদি শিশিরের দেখা পায়, তাহা হইলে তখনই তাহাকে লইয়া সে দেশে যাত্রা করিবে। ললিত আজ একাকীই বৌবাজারের সেই মদের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে একটু নজর করিতেই সে দেখিল শিশির অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় ঘরের ভিতর বসিয়া মদ খাইতেছে। তাহার কেশরাশি রুক্ষ, চক্ষু রক্তবর্ণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন ও মলিন; এ বেশে কেহই তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিবে

না। ললিত তাহার জন্য বাহিরেই অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিল। সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সব মদে খরচ করিয়া শিশির টলিতে টলিতে দোকানের বাহিরে চলিয়া আসিল। ললিত তাহার পাশে গিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল। শিশির নেশায় উন্মত্ত থাকিলেও এ অবস্থায় ললিতের নিকট ধরা পড়ায় নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ললিত শিশিরের হাত ধরিয়া তাহাকে একধারে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন আছ কোথায়?"

শিশির ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল,—"এই—এই বেশী দূরে নয়, কাছেই। তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি না।"

"কেন?"

"সে বড় অপরিষ্কার ঘর।"

"তাতে কিছু এসে যায় না! আমি দেখবো বলেই এসেছি; চল, সোজাই যাবো?"

ললিতের কণ্ঠস্বর দৃঢ়। বালকে যেমন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পূজনীয় ব্যক্তির আদেশ মানিয়া চলে, শিশিরও সেরূপ ললিতের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। নিকটেই এক-খানি খোলার ঘরের সম্মুখে আসিয়া সে থামিল; পরে পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া ঘর খুলিল। ঘরের ভিতর ঢুকিতে গিয়া চৌকাটে হোঁচট খাইয়া শিশির ঘরের ভিতর পড়িয়া গেল।

"কই, আলো জ্বাল।" ললিত বাহিরে দাঁড়াইয়া শিশিরকে

আলো জ্বালিতে বলিল। অন্ধকারে ঘরের ভিতর ঢুকিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না।

"ঘরে তেল নেই। আজ তিন দিন তেল কিনতে পারি নি। ঘর খুল্লেই রাস্তার গ্যাসের আলো ঘরের ভেতর ঢুকে।"

এমন সময় পাশের ঘর হইতে আলোক হস্তে একজন লোক বাহির হইয়া আসিয়া শিশিরের সম্মুখীন হইল। শিশিরের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে চেঁচাইয়া বলিল,—"এই যে কাল ভাড়া চাইতে বল্লে হাতে একটীও পয়সা নেই, আর আজ দিব্যি মদ খেয়ে এসেছ, দেখছি যে! এর বেলা পয়সা বেশ জোটে!"

ললিত তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আলোটা একবার আমাকে দেবেন?"

ললিত অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল, বাড়ীওয়ালা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। তাহার দিকে চাহিতেই লোকটার উগ্রভাব অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল। সে ললিতকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি আমাকে কিছু বলছিলেন?"

"আমি এই এঁর সঙ্গে এসেছি, আপনার আলোটা একবার দেবেন, ঘরের ভেতর ঢুকবো?"

"আপনি চাচ্ছেন, তাই দিলাম। উনি মশাই আজ এক মাসের ওপর হয়ে গেল আমার ঘরে এসেছেন, ভাড়া চাচ্ছি, দিচ্ছেন না। আবার পাঁচ টাকা আমার কাছে একদিন ধারও করেছেন।"

ললিত জামার পকেটে হাত দিয়া বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ পর্য্যন্ত হিসেব করে সব শুদ্ধ আপনার কত পাওনা হয়েছে ?"

"সবশুদ্ধ তাহলে তের টাকা হবে।"

ললিত তাহাকে হু'খানি নোট দিল, একখানি দশ টাকার, আর একখানি পাঁচ টাকার।

"আপনি একটু অপেক্ষা করুন। বাড়ীতে খুচরা টাকা নেই। আমি নোট ভাঙ্গিয়ে বাকি হু টাকা আপনাকে ফেরত এনে দিচ্ছি।"

"থাক, ও আর দিতে হবে না। শিশির আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তার জন্যে হুটাকা আপনিই রেখে দিন।"

"মশাই, আপনার ন্যায় ভদ্রলোক খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। আপনারা কি আজ রাত্রেই চলে যাবেন ?"

"হাঁ, এখনই যাব। আপনি যদি একটি উপকার করেন, আপনার কোনও লোককে দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যাবে একখানা গাড়ী ডেকে দেন।"

বাড়ীওয়ালা চলিয়া গেল। ললিত আলো হাতে করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। দেখিল, শিশির এক ছিন্ন মাহুরির উপর শুইয়া পড়িয়াছে। ঘরের বিছানার মধ্যে ঐ এক ছিন্ন মাহুরি। ললিত অগ্রসর হইয়া তাহাকে তুলিল।

"শিশির, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

তার উত্তর চাই। তোমার ব্যবহারে আমাদের দুঃখ কষ্টের সীমা নেই। কলেজে নাম কেটে দিয়েছে, বাবা এখনও শুনেন নি; কিন্তু তুমি যে তাঁর নামসহি জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে উড়িয়েছ, এ কথা সত্যি?”

শিশির হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মদ খাইলে মনে অনুতাপ আসিলে প্রায়ই সে এরূপ কাঁদিত।

ললিত বুঝিল, শিশির মুখে স্বীকার করিতে না পারিয়া কাঁদিতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া ললিত একটু বিচলিত হইল। সে স্নেহভরে ভায়ের পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। শিশির একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—“আমার বড়ই টাকার অভাব হয়েছিল। আমি মরিয়া হয়ে গেছলাম। বাবা বেশী টাকা দিতে চাইলেন না, আমি এ ভিন্ন অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। টাকা তখন না পেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হতো।”

ললিত জিজ্ঞাসা করিল,—“ব্যাঙ্কের সব টাকাই নষ্ট করলে কেন? বাবা ত শুনে মৃতপ্রায় হয়ে আছেন।”

শিশির ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—“সঙ্গদোষে পড়ে সব বাজি খেলে হেরেছি। আমার মাথার ঠিক ছিল না।”

ললিত ঘরের ভিতরটা একবার ভাল করিয়া দেখিল। ঘরের ভিতর কোনও আসবাব-পত্র নাই। সে শিশিরকে

জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বই, অস্ত্রশস্ত্র, বাক্স, তোরঙ্গ, চেয়ার, টেবিল, আসবাব পত্র সব কি হলো?"

"সব বেচে ফেলেছি।"

"ঘড়ি চেন, পোষাক পরিচ্ছদ?"

"বাঁধা দিয়েছি। সে এখন সুদে আসলে ঢের হয়ে গেছে।"

ললিত মনে মনে ভাবিল,—"কাজ সব এগিয়ে রেখেছে দেখছি। নিজেকে বাঁধা দেবার উপায় থাকলে, তাও বোধ হয় দিত।" পরে শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহলে এই কাপড় চোপড় যা পরে রয়েছ, এ ভিন্ন আর কিছুই তোমার নেই?"

"না। দাদা, আমাকে ক্ষমা কর। বাবাকেও বলো আমাকে ক্ষমা করতে। আমি বংশের কুলাঙ্গার জন্মেছি! তুমি বুঝিয়ে বল্লে, বাবা তোমার কথা শুনতে পারেন।"

"তোমার দেখছি হাতে পয়সা নেই, পরণে কাপড় নেই, অনাহারে দিন কাটাচ্ছো। আমি না এলে তোমার দশা কি হতো? কাল তুমি কি করতে তাহলে?"

"আত্মহত্যা করতাম।"

ললিত নীরবে মনে মনে ভাবিতে লাগিল। এমন সময় বাড়ীওয়ালা গাড়ী লইয়া হাজির করিল। ললিত শিশিরকে বলিল,—"চল, গাড়ীতে উঠবে চলো। জিনিষপত্র ত আর কিছু সঙ্গে নেবার নেই!"

"না, আমি যাব না। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

"বাড়ী।"

শিশির চমকিয়া উঠিল। "বাড়ী! না বাড়ী যাবো না। দাদা আমাকে ক্ষমা কর। আমি বাবার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না।"

ললিত কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া বলিল,—"জেলে পচার চেয়ে সেটা কি ঢের ভাল নয়? বাবার হুকুম, দুয়ের এক আমাকে করতেই হবে, হয় তোমাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, নয় পুলিসে খবর দেওয়া। দেখ, যেটা পছন্দ কর।"

শিশির জেলের নাম শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ললিত তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে গাড়ীতে উঠাইল। শিশির দু' একবার বাধা দিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার তেমন আর জোর ছিল না।

ললিত গাড়োয়ানকে হাওড়া ষ্টেসনে যাইতে হুকুম করিল। সুধীর কিংবা বিমলের সহিত দেখা করিতে আর তাহার সাহস হইল না, ভয় পাছে সুযোগ পাইলেই শিশির চম্পট দেয়। সে ভাবিল বাড়ীতে পৌছিয়া পত্রে তাহাদের সংবাদ দিলেই হইবে। গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। প্রথম ট্রেনেই ললিত শিশিরকে লইয়া বাড়ী রওনা হইল।

শিশির বাড়ী ফিরিয়া আসিল। শিশিরের কেলেঙ্কারীর কথা বাহিরের কেহই টের পাইল না। দেশের সকলেই মনে করিল, সে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছে; তবে কিছু দিন পরে

তাহাকে পিতার কারবারে বাহির হইতে দেখিয়া সে ভ্রান্ত ধারণা তাহাদের মন হইতে দূর হইয়া গেল।

শিশির একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। তবু বাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া শিবশঙ্কর বাবু তাহাকে আফিসে লঘু কাজ করিতে দিতেন। শিশির লজ্জায় পূর্ব্বের ন্যায় এই "নীচ" কাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে কোনও অভিযোগ করিতে সাহস করিত না। সে যে কতদূর গর্হিত কাজ করিয়াছে এবং ইঁহারা তাহা সত্ত্বেও তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি কতটা দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সে বুঝিত; কিন্তু তবুও গোপনে মাতার নিকট সে প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিত, "ভগবান আমার অদৃষ্টে শেষে এত কষ্টও লিখেছিলেন!"